সমাজ-চিন্তা।

অথবা

ইয়োরোপীয় এবং স্বদেশীয় সমাজ-বিষয়ক প্রস্তাব

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

"Liberty, Equality, and Love."

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

দর্জিপাড়া, ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট্ ইডিন্ প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

স্বাধীনতার বিস্তারিত ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমি মানবসমাজের প্রতি অবলোকন করিয়াছি। সেই দৃষ্টিতে স্বদেশীয় ও ইয়োরোপীয় সমাজ যেরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহারই ছবি এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইয়োরোপীয় সমাজের বর্ত্তমান উন্নতি ও সভ্যতার কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীত হইয়াছে যে, মানবপ্রকৃতির স্বাধীনতাই সেই উন্নতি ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির আদি কারণ। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বৃহৎ দৃশ্য-পটের অভ্যন্তরে আমি এই স্বাধীনতা-দেবীকে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের মধ্যে জাজ্বল্যমান দেখিয়াছি। এসিয়াস্থ দেশ সমূহের প্রাচ্য সভ্যতার সহিত ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিভিন্নতারও কারণ এই স্বাধীনতা। বাস্তবিক, স্বাধীনতাতেই যে মানবপ্রকৃতির ও মানবসমাজের স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতিসাধন হয় এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, মানব-সমাজে সেই স্বাধীনতার ভাব কতদূর বিদ্যমান আছে, তাহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরীক্ষায় দেখিয়াছি, ইয়ো-

রোপীয় সমাজের মূলভিত্তি ঠিক এই স্বাধীনতার উপর স্থাপিত; এবং প্রাচ্য সমাজের মূলভিত্তিতে ইহার বিলক্ষণ অসদ্ভাব। ভারতবর্ষীয় সমাজের এখন পরিবর্ত্তন কাল। এই কালে সমাজকে স্বাধীনতার উপর স্থাপিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যতা সাধারণ জনগণের মনে প্রতীত করিয়া দিবার জন্য আমি এই পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার মত যদি ভ্রান্ত হয়, আমার ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইলে আপনাকে উপকৃত জ্ঞান করিব। শুদ্ধ আমার উপকার কেন, আমার মতাবলম্বী সকল লোকেরই উপকার হইবে। আর আমার মত যদি অভ্রান্ত হয়, লোকে তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্যপথ অবলম্বন করিলে, কৃতার্থ হইব।

আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত আমার কতিপয় প্রবন্ধ একত্রিত, সম্বর্দ্ধিত, ও একভাব-সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি। সুতরাং সেই প্রবন্ধ সমূহ এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। আমার অনুমান, পাঠকগণেরও নিকট তাহারা এক অপূর্ব্ব নূতনভাবে প্রতীত হইতে পারিবে।

গ্রন্থকার।

সমাজ-চিন্তা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইয়োরোপীয় সমাজ।

প্রথম চিন্তা—সামাজিক ভাব।

আমরা বিদেশীয় ইংরাজগণকে স্বদেশ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তদ্বিনিময়ে যাহা লাভ করিতেছি, তাহা অমূল্য ধন। আজি ইংরাজগণ অল্প স্বার্থসিদ্ধির বিনিময়ে যে ধন বিতরণ করিতেছেন, সেই ধনে ভারতবর্ষ যবে ধনী হইবে, তখন ভারতের অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইবে। ভারত নবজীবনে চিরদিনের জন্য আবার জাগরিত হইয়া উঠিবে। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা ইংরাজগণ ভারতের মৃতদেহে অল্পে অল্পে চৈতন্য সঞ্চার করিতেছেন। অসাড় ভারত এক এক বার কাঁপিয়া উঠিতেছে। শত

শত বর্ষ ধরিয়া [illegible]তে তাঁহাদিগের রাজত্ব দৃ[illegible] আমাদিগের আন্তরিক বাসনা, এই [illegible]না।

সুসভ্য রোম একদা অসভ্য ইয়োরোপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে রোমের লাভ অতি অল্পই হইয়াছিল; বরং রোমের ধ্বংসের তাহাই অন্যতম কারণ। কিন্তু অসভ্য ইয়োরোপ রোমের কাছে যাহা লাভ করিয়াছিল, তাহারই জন্য ইয়োরোপ আজি দাঁড়াইয়া আছে; আজি ইয়োরোপ পৃথিবীর গৌরব-ভূমি। এক রোমের ধ্বংস হইয়াছে, ইয়োরোপে শত শত রোম উত্থিত হইয়াছে। রোম ত বিধ্বস্ত হয় নাই, রোম স্থান ও মূর্ত্তি পরিবর্ত্ত করিয়া ইয়োরোপের প্রতি বিঘায় নবজীবনে সমুত্থিত হইয়াছে। আজি রোমজাতীয় প্লিবিয়নের ভাব ইয়োরোপীয় সামান্য জনগণের হৃদয়াগ্নি; পেট্রিসিয়ানের ভাব ইয়োরোপীয় উচ্চ বংশধরগণের গৌরব, ও হৃদয়ের প্রধান সম্পত্তি। রোমের স্বদেশ ও স্বজাতি-অনুরাগ ইয়োরোপীয়গণের বিশেষ ধর্ম্ম ও বল। এই সমস্ত ভাব গ্রীস রোমকে শিক্ষা দিয়াছে, রোম সমগ্র ইয়োরোপমণ্ডলে তাহা শিক্ষা দিয়াছে। শুধু শিক্ষা নয়, ইয়োরোপের অন্তরে অন্তরে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইয়োরোপ এই অগ্নিতে আজি এত তেজস্বী যে, সে তেজ সমস্ত পৃথিবীতেও ধারণা হয় না। সে অগ্নি সংক্রামক; তাহার উষ্ণতা ও তাপ ইয়োরোপীয়গণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীময় বিস্তার হইতেছে।

রোম রাজনৈতিক প্রভুত্ব হারাইয়া পতিত হইল। কিন্তু যে রোম একবার পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছে, সে রোম সহসা পতিত হইয়া থাকিবার নহে। রোম অন্যবিধ প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিল; পৃথিবীতে ধর্ম্ম-রাজ্য ও শাসন স্থাপন করিল। ইয়োরোপ রোমের নিকট নত-শির হইয়া আবার প্রণাম করিল। প্রণত ইয়োরোপের শীর্ষদেশ রোম আবার পদ-দলিত করিল। রোম এই প্রভুত্বের গৌরবে উন্নত হইয়া উঠিল। উন্মত্ত ধর্ম্ম্য-রোমের শির টলিল। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা রহিত হইল। রোম ইয়োরোপে যথেচ্ছা শাসন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম্য-রোম জানিত না যে, তদীয় পূর্ব্বপুরুষ রাজনৈতিক রোম যে অগ্নি ইয়োরোপময় সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে ইয়োরোপ এত তেজস্বী ও পরিপুষ্ট হইয়াছে যে, তাহার পরাক্রম আজি প্রতিরোধ করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। যেখানে ইয়োরোপ রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, রোম অমনি তথা হইতে পরাস্ত হইয়া পলাইয়া আসিল; জানিল, যে তেজ প্রাচীন রোম হারাইয়াছে, সেই তেজ আজি ইয়োরোপের বল ও দুর্গ। তাহার সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য?

ইয়োরোপ রোমের আইন ও ব্যবস্থা পাইয়াছিল; রোমের নিকট স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম শিক্ষা করিয়াছিল। রোমের ব্যবস্থায় ন্যায়, অন্যায়, প্রতি লোকের স্বত্ব ও অধিকার তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল। প্লিবিয়নদিগের যে তেজ ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ,

তাহা সংক্রামিত হইয়া ইয়োরোপময় বিস্তারিত হইয়াছিল। সেই তেজ ও অনুরাগ ক্রমশঃ সামান্য জনগণের মধ্যে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। ইয়োরোপীয়গণ আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার এত তন্ন তন্ন বুঝিত, স্বাধীনতার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, তাহারা তাহাতেই চালিত হইয়া সকল অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবিরুদ্ধে দাঁড়াইত। একদা তাহারই বলে রোমের ধর্ম্ম্য-রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল—প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সৃষ্টি করিল; এই ধর্ম্মের নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শত শত ধর্ম্ম্য-মঠ ধরাশায়ী করিল। হাজার হাজার উদাসীন লোক ধর্ম্ম্য-মঠের অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত হইয়া পার্থিব কার্য্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিল। ইহাতে ইয়োরোপের যে শুভফল ঘটিয়াছে, তাহা সমৃদ্ধ ইংলণ্ড অতি স্পষ্টরূপে পরিচয় দেয়। আজি ইংলণ্ডের জনগণ স্বদেশকে স্বর্গতুল্য করিয়াছে। তাহাদিগের পরিশ্রমবলে দেশ স্বর্ণময় হইয়াছে। ঐহিক সুখে ইংলণ্ড পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ইংলণ্ড আজি ভারতের শিক্ষা গুরু! ইংলণ্ড ভারতকে যে বিদ্যা ও শিক্ষা দান করিতেছে, ভারত সে শিক্ষা কুত্রাপি পাইত না। মুসলমানগণ ভারতকে সে শিক্ষা দিতে পারে নাই, ভারতীয় ইতিহাসে, ভারতীয় সাহিত্যে সে শিক্ষা নাই। ইংরাজগণ যদি ভারতকে আপন বিদ্যাদান না করিত, আজি ভারত পূর্ব্বের ন্যায় অনভিজ্ঞ থাকিত। ইংরাজগণ হইতে আমরা এই চারিটি প্রধান ও নূতন ভাব লাভ করিয়াছি।

১। ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগ।

২। স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ।

৩। স্বদেশের প্রতি অনুরাগ।

৪। স্বজাতির প্রতি অনুরাগ।

১। শঙ্করাচার্য্যের ঔদাসীন্য বোধ হয় ভারতের যত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, এত দূর কিছুতেই করে নাই। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভারতীয় সকল ধর্ম্মের উপদেশ। সাংসারিক সুখ তুচ্ছ করিয়া পরমার্থ-চিন্তা ও অনুধাবন করাই ভারতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মনীতি। এই ধর্ম্মনীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভারতবাসিগণ চিরকাল সংসার-কার্য্য ও ঐহিক সুখের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসিগণ চিরদিন ভাবিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীতে পৃথিবীর জন্য আসেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য আসিয়াছেন। পৃথিবী উৎসন্ন যাউক, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি নাই, কিন্তু কিছুতেই ঈশ্বরচিন্তায় না ব্যাঘাত ঘটে, এইমাত্র আবশ্যক। সংসার, সমাজ, স্বদেশ তাঁহাদিগের চিন্তায় কখন প্রবিষ্ট হয় নাই। তাঁহারা ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া চিরদিন লালায়িত হইয়াছেন। দেশের প্রতি চাহেন নাই, সমাজের প্রতি চাহেন নাই, এমত কি, আপনার শরীরের প্রতিও চাহেন নাই। আমি বলি না, সকল ভারতবাসীই বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। আমি এই বলিতে চাহি, যে ভারতবাসী সাধারণ-লোকের অনুরাগ বৈরাগ্যের দিকে যত ছিল, সংসারের প্রতি তত ছিল না। তাঁহারা সংসা-

অপেক্ষা সংসারের প্রতি ঔদাসীন্যকে উচ্চতর জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদিগের মনের গতি ঔদাসীন্যের দিকে যত ধাবিত হইত, সংসারের দিকে তত ধাবিত হইত না। সাংসারিক সুখ অতি নীচ বিষয় বলিয়া তাহা অনুধাবনে তত যত্ন করিতেন না। সাংসারিক সুখ হয় হউক, না হয় নাই হউক, এই রূপ ভাবিয়া সংসারধর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা, তজ্জন্য অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করা তাঁহাদিগের মতে অতি হেয়জ্ঞান ছিল। যাহারা কেবল সংসার লইয়া ব্যস্ত, তাঁহাদিগের মতে তাহারা অতি নীচ ও অপদার্থ লোক। ভারতীয় সভ্যতার প্রবণতা এই ছিল। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরানুরাগই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। ভারতীয় সভ্যতা সাংসারিক সুখে ব্যস্ত ছিল না। ব্রাহ্মণজাতি ভারতীয় সভ্যতার প্রধান জাতি। বৈশ্য ও ব্যবসায়ী জাতি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। পরিশ্রম, ব্যবসা, বাণিজ্যকে ভারতীয় সভ্যতা অতি হেয়জ্ঞান করিয়াছে। ইহা কখন অর্থের জন্য লোলুপ হয় নাই। রাজ্য, ধন, সম্পত্তি ইহার বিষয়ীভূত নহে। যে বিদ্যা ইহা আলোচনা করিয়াছে, তাহা পরমার্থ-বিদ্যা ও মোক্ষধর্ম্ম। ভারতের ইতিহাসে মোক্ষধর্ম্ম, দর্শনে মোক্ষধর্ম্ম, পুরাণে মোক্ষধর্ম্ম। পুরাণই তাহার প্রধান সাহিত্য। দেবালয়ে তাহার শিল্প চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইত। পারমার্থিক ব্যয়ই ধনের সদ্ব্যয়। ইতর জাতির অনুষ্ঠান উচ্চ জাতির অবলম্বনীয় নহে। সংসার-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রস্তুত, নির্ম্মাণ

ও অবলম্বন করিয়া থাকা ইতর জাতির কার্য্য। ম্লেচ্ছ রীতি-নীতি অবলম্বনীয় নহে। ম্লেচ্ছজাতি অস্পৃশ্য। সিন্ধু নদী পার হইলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত। যে দেশে এরূপ সভ্যতা প্রচারিত, সে দেশের কি কখন উন্নতি হয়? উন্নতির সকল পথে ভারতীয় সভ্যতা কণ্টকার্পণ করিয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা কখন উন্নত হয় নাই। তাহাতে উন্নত ভাব প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার গতি এক দিকেই ছিল। একদেশ মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে, আর কোন বিদেশীয় ভাব প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। ধর্ম্ম হইতে তাহা উত্থিত হইয়াছে, চিরকাল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই তাহা ব্যস্ত ছিল। ইজিপ্ত, ফিনিসিয়, গ্রীসীয় সভ্যতার পত্তন-ভূমি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া যেমন তাহা স্বতন্ত্র দিকে ধাবিত হইয়াছিল, ভারতীয় সভ্যতার মূল তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্র হওয়াতে, চিরকাল তাহা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই পাগল হইয়াছে।

আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রবণতা অন্যরূপ। সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই এই সভ্যতার লক্ষ্য। ইহা মানব-মনের সুখ-প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি রোধ করিয়া তাহা শুষ্ক করিতে চাহে না, কিন্তু সেই সুখ-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি সাধন করিতে চাহে। পরলোকের অদৃশ্য, ও কাল্পনিক স্বর্গের দিকে ইহার লক্ষ্য নহে, ইহলোককেই স্বর্গতুল্য করা ইহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মচিন্তা ইহার সাধন নহে; প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান, পরিশ্রম, যত্ন, ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, উন্নতি-চিন্তা, দেশ-পর্য্যটন, বহু-

দর্শন, চিন্তা, কল, কৌশল প্রভৃতি ইহার অসংখ্য সাধন। সুখভোগ, সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রভৃতি ইহার বিষয়। এ সভ্যতাও নিরীশ্বর নহে। তবে ইহার ঈশ্বর বনের ঈশ্বর নহে, যোগের ঈশ্বর নহে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, ধ্যানের ঈশ্বর নহে। ইহার ঈশ্বর সংসার-ধর্ম্মের ঈশ্বর, লোক-ধর্ম্মের ঈশ্বর, সমাজ-ধর্ম্মের ঈশ্বর, রাজ-ধর্ম্মের ঈশ্বর, ও কার্য্যের ঈশ্বর। চীরপরিধান করিয়া অসাড় হইয়া থাকিলে ইহার যোগসাধন হয় না। কিন্তু চীরপরিধান করিয়া কেবল কার্য্য করিলে ইহার যোগসাধন হয়। মানব-প্রকৃতিকে নিপীড়ন, শাসন, নির্জ্জীব, ও বিশুষ্ক করিয়া তাহাকে অধীন করা ইহার সাধনা নহে, কিন্তু মানব-প্রকৃতির সম্যক্ উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়াই ইহার প্রধান সাধনা। ইহার দেবালয় বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যালয়, বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান ও সমুদায় বিদেশ। ধর্ম্ম ইহার পত্তনভূমি নহে, কিন্তু ইহার পার্শ্ব-স্তম্ভ। সংসারী হইয়া সন্ন্যাসী হও, এই ইহার আদেশ ও ধর্ম্মনীতি। ইহার ধর্ম্মনীতি কহে, যদি উদাসীন হইতে চাও, তবে সমাজের হিতের জন্য, স্বদেশের হিতের জন্য, বিদ্যার উন্নতির জন্য, একদা ঔদাসীন্য অবলম্বন কর। বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি এ সভ্যতার বিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্র। লৌহবর্ত্ম ও সমুদ্র ইহার বাহন। তাড়িত-তার ইহার দূত। ইহার যোগিগণ দেশবিদেশে যাইয়া উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছে। ইহার ঋষিগণ সংসারাশ্রমে বসিয়া জ্ঞানের উন্নতি সাধন

ও চিন্তার পথ প্রসারিত করিতেছে। এ সভ্যতা যে দেশে যায় সে দেশ হাসিতে থাকে। ইয়োরোপ হইতে আমেরিকায় গিয়া ইহা আমেরিকাকে হাসাইয়াছে। আমেরিকার মৃত্তিকায় স্বর্ণ ফলিয়াছে। তাহার চির-তুষারাবৃত দেশ সমূহে উন্নতির পতাকা রোপিত হইয়াছে।

এই সভ্যতার প্রধান বাহক ইংরাজগণ। ইংরাজগণ ইহাকে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে লইয়া যাইতেছেন। যেখানে তাহাদিগের অভ্যুদয় ও রাজত্ব, সেইখানেই ইয়োরোপীয় সভ্যতার হাস্যময় বদন-বিকাশ। আমরা তাহাদিগের নিকটেই এই সভ্যতার নবভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। এতদ্দেশীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত ইহার তুলনা করিয়াছি। তুলনা করিয়া ইহাকে শুদ্ধ শ্রেষ্ঠত্ব দিই নাই, ইহাকে আদরের সহিত অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহা আমাদিগের চক্ষুঃ ফুটাইয়া দিয়াছে। আমাদিগের দৃষ্টি এক নূতন বিষয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। এখন ঐহিক সুখ ও উন্নতির প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, সংসারকে পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম নহে, কিন্তু মহাপাতক। সংসারের কার্য্য করাই প্রধান ধর্ম্ম, যোগ, ধ্যান ও জ্ঞান। যদি উদাসীন হইতে চাও তবে সংসারের কার্য্য করিবার জন্য উদাসীন হও। সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করিলেই ঈশ্বরের উপাসনা, ধ্যান ও সন্তোষ হয়। তদ্ভিন্ন অন্য যোগ নাই, অন্য ঈশ্বর-সাধনা নাই। সংসার বিচ্ছিন্ন ঈশ্বর নাই, সংসারকে ত্যাগ করিলে কখন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংসার-ধামেই মানব দেব-

ভাব প্রাপ্ত হয়; মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়, তাহার সকল উৎকৃষ্ট গুণের স্ফর্ত্তি হয়। যিনি ঐহিক সুখের বৃদ্ধি করিতে পারেন, তিনিই পারলৌকিক সুখের ভাগী হন; তিনিই যথার্থ পুণ্যবান্, তাঁহারই জীবন পবিত্র। যিনি ঐহিক সুখ ত্যাগ করেন তিনি উভয় সুখেই বঞ্চিত হন। যে মানব পৃথিবীর অলঙ্কার ও শোভা, যিনি পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন, নানা শোভায় শোভিত করিবেন, নানা সুখে পরিপূর্ণ করিবেন, তিনি পৃথিবীর প্রতি উদাসীন থাকিলে পৃথিবীর ভাগ্য যে অতি শোচনীয় হইবে তাহার আর সংশয় কি?

২। এদেশে স্বাধীনতার ভাব যে কখন বিদ্যমান ছিল এমত বোধ হয় না। যে দেশ চিরকাল ভূপতির অলঙ্ঘনীয় প্রভুশক্তির অধীন, যে দেশে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু, যে দেশে রাজা পৃথিবীতে দেবতা-স্বরূপ, যাঁহার বিরুদ্ধাচরণ স্বপ্নেও আনা মহাপাপ, সে দেশে স্বাধীনতার ভাব কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে? অধীনতার অলঙ্ঘ্য নিগড় যে দেশে প্রকৃতিবর্গের অলঙ্কার, সম্পূর্ণরূপে ভূপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া যে দেশে প্রজামণ্ডলীর প্রধান কর্ত্তব্য, যে দেশে রাজাজ্ঞাই শাসন, যে দেশে ধর্ম্ম ব্যতীত রাজশক্তির আর কোন শাসন নাই, সে দেশে স্বাধীনতার ভাব কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে? সে দেশে যদি কেহ স্বাধীন থাকিতে পারে সে রাজা। যে দেশে স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারিতার প্রভেদ জানিবার কোন উপায় নাই, সে দেশে কখন প্রকৃত স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি

পাইতে পারে না। এ দেশে স্বাধীনতার অর্থ চিরকাল আপেক্ষিক ভাবে প্রয়োজিত হইয়াছে। বিদেশীয় রাজার যাহা অধীন নহে তাহাই স্বাধীন। এই অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে স্বাধীনতা শব্দ বোধ হয় ভারতবর্ষে কখন প্রয়োজিত হয় নাই। রাজার একাধিপত্য থাকিতে ভারতে প্রকৃতি-বর্গের স্বাধীনতা শব্দের অর্থ হয় না।

সাধারণ জনগণের অধীনতা যে শুদ্ধ রাজ সম্বন্ধেই এইরূপ ছিল এমত নহে। এখানে আর এক প্রকার সামাজিক অধীনতা ছিল। জাতি ও বর্ণভেদে তাহার উৎপত্তি। ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মণজাতির অপরিসীম ক্ষমতা। অন্য সর্ব্বজাতি ব্রাহ্মণের পদানত, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রাহ্মণের হস্ত-গত। ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ মহা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ প্রমত্তভাবে সমাজকে আত্মশাসনে রাখিতেন। পৃথিবীতে রাজাই একাকী দেবতা নহে, ব্রাহ্মণগণ পরম আরাধ্য ও দেবার্চ্চনীয়। ভূপতিও ব্রাহ্মণকে শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মণ দেবতার দেবতা। তাহার বাক্য অলঙ্ঘনীয়; তাহার আদেশই শাস্ত্র, তাহার ভ্রূকুটিই শাসন। তাহার অভিসম্পাতভয়ে সর্ব্বজনই সর্ব্বক্ষণ শঙ্কাকুল। যাঁহার যাহা বিপদ্ ও দৈবতুর্ব্বিপাক ঘটিত তিনি তাহা ব্রাহ্মণকোপের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত রাজার শাসনদণ্ড অপেক্ষাও ভয়ার্হ। এই ব্রাহ্মণজাতির শাসনে সমাজ থরহরি কম্পবান্। ব্রাহ্মণাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন ভূপতিরও ক্ষমতা নাই। স্বার্থপর ও ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণজাতিও আপন স্বার্থ সাধন জন্য সমাজকে

যথেচ্ছা চালিত ও শাসিত করিয়া লইতেন। যখন তাঁহার শক্তির আর অবধি রহিল না, তখন তিনি অগ্রসর হইয়া এক নূতন শাস্ত্রের প্রণেতা হইলেন। সেই শাস্ত্রের নাম পুরাণ। চিরদিনের জন্য আপনাদিগের ক্ষমতা প্রবর্ত্তিত রাখিবার জন্য এই মহাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। সেই মহাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্রে তাঁহারা আজিও সমাজকে শাসন করিয়া আসিতেছেন। যে দেশে এক জাতির এতদূর শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি স্বীকৃত হয়, সে দেশে সামাজিক স্বাধীনতার ভাব কখন স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না।

কিন্তু সমাজে যে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ জাতিরই শ্রেষ্ঠত্ব এমত নহে। এদেশে এই জাতি-বিভাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সমাজ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্ট জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীস্থ জাতিগণ অত্যন্ত ঘৃণার্হ, অস্পৃশ্য ও নিতান্ত হেয়। সমাজে তাহাদিগের ক্ষমতা ও অধিকার কিছুই নাই। তাহারা উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতির অবজ্ঞাপাত্র হইয়া নিতান্ত মনোবেদনায় ও সম্পূর্ণ অধীনতায় জড়ভাবে দিনযাপন করে। তাহারা এই নীচ ভাবে এতদূর অবসন্ন যে, তাহাদিগের উচ্চ কথা কহিবারও সাহস নাই। তাহারা সমাজে অতি দীন ভাবে অবস্থান করে। অথচ তাহারাই লোক সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগেরই হাতে কৃষি, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি সমাজের সকল প্রয়োজনীয় ও গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। তাহারা যে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিবে, ব্রাহ্মণ-সেবায় তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়িত হইবে। রাজা যাহা পারিবেন কাড়িয়া লইবেন।

তাহারা নিতান্ত মূর্খ, অনায়াসেই প্রতারিত হইতে পারে, সুতরাং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায়ও তাহাদিগের বিত্ত বিলক্ষণ ব্যয়িত হয়। যে জাতিরা এত নিঃস্ব ও হেয় তাহারা কি কখন তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ হইতে পারে? যে দেশের সামাজিক ও ধর্ম্ম্য অধীনতা এতদূর, সে দেশে কি কখন স্বাধীনতার ভাব বিদ্যমান ছিল, এমত অনুমিতি হয়?

এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার অধীনতায়ও দেশ চিরকাল অনুশাসিত হইয়া আসিয়াছে। এই অধীনতার নাম পারিবারিক অধীনতা। সমগ্র দেশের মধ্যে রাজার অধীনতা, সমগ্র সমাজের মধ্যে জাতীয় অধীনতা, আবার গৃহধামে কর্ত্তৃজনের সম্পূর্ণ অধীনতা। কোন স্থানে লোকের একটু মাত্র স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি পাইবার যো ছিল না। সমাজে তাহার ঘোর অধীনতা, রাজদ্বারে তাহার কৃতাঞ্জলি, গৃহধামে তাহার একান্ত বশবর্ত্তিতা। এখানে আর এক প্রভুতার নিতান্ত অধীন হইয়া না থাকা মহাপাপ ও নিন্দার কথা। পিতৃগণ যে রূপই হউন না কেন, চিরদিন তাঁহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতেই হইবে। তাঁহাদিগের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় ও শিরোধার্য্য। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে তুমি কথা কহিতে সাহসীও হইতে পার না। তাঁহারা তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন ভালই, সে পরামর্শ তোমাকে অতি দীনভাবে তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহারা যাহা করিবেন তাহার বিরুদ্ধে তোমার কোন কথা

কহিবার যো নাই। তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। একান্নবর্ত্তী হইয়া পরিবার মধ্যে তাঁহাদিগের অধীন থাকা ভিন্ন তোমার আর অন্য গতি নাই। শৈশব হইতে তাঁহাদিগের এই সম্পূর্ণ অধীনতায় তোমার প্রকৃতি এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, বয়স হইলে সে প্রকৃতির আর কিছুই তেজ থাকে না। যে সময়ে তুমি আবার কর্তৃত্ব পাও, তখনও নিজ সন্তান সন্ততিগণকে সম অধীনতায় অভ্যস্ত করিয়া আনিতে চাও। বংশ-পরম্পরায় এই ঘোর পারিবারিক অধীনতা চলিয়া আসিতেছে। এই অধীনতায় কখন স্বাধীনতার ভাব সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না *।

আর এক প্রকার অধীনতার দৃষ্টান্ত আমরা পরিবার মধ্যে দেখিতে পাই। তাহা স্ত্রীজাতির অধীনতা। আমাদিগের পুরস্ত্রীগণ একেবারে অধীনতার মূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বামী তাহাদিগের দেবতা। স্বামী তাহাদিগের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। স্বামীর বিপক্ষে তাহাদিগের উচ্চ বাচ্য কহিবার যো নাই। স্বামীর অত্যাচারে ও ব্যবহারে তাহারা দিনযামিনী ক্রন্দন করিলেও কেহ তাহাদিগের আহা বলিবার লোক নাই। তাহারা যখন আবার বধূ অবস্থায় গৃহমধ্যে অবস্থান করে, তখন তাহাদিগের যে শুদ্ধ স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিতে হয় এমত নহে, তখন পরিবার মধ্যে সকল

* স্থলান্তরে এই পারিবারিক অধীনতা বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

বয়োধিকাগণের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকিতে হয়। সন্তান সন্ততিগণ শৈশব হইতেই মাতার এই ঘোর অধীনতার দৃষ্টান্ত অহরহ দেখিতে থাকে। মাতার পক্ষে তাহাদিগের কিছুই করিবার যো নাই, বলিবারও যো নাই। মাতার সেই অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের প্রকৃতি নিস্তেজ হইয়া আইসে। সন্তানেরা আশৈশব যে অধীনতার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, বয়স হইলে আবার আপন আপন কলত্রকে তদ্রূপ অধীনতায় না রাখিতে পারিলে সুখী হইতে পারেন না। পরিবারের কর্তৃত্ব পাইলে, পুরস্ত্রীগণকে যে অধীনতার বশবর্ত্তিনী বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহারা আবার তাহাদিগকে সেই অধীনতায় রাখিয়া থাকেন *। চারিদিকের এই ঘোর অধীনতার দৃষ্টান্ত মধ্যে কি স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে?

ব্যবসা বৃত্তিতেও এই অধীনতা। ভারতবাসিগণ জাতি অনুসারে জীবন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। আমার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, ক্ষমতা যেরূপ হউক না, আমি যদি কৃষক হইয়া জন্মিয়া থাকি, তবে সেই কৃষিকার্য্য ভিন্ন অন্য পথে আমার যাইবার যো নাই। আমাকে কৃষক হইয়া থাকিতেই হইবে। অন্য লোক অন্য বৃত্তি অবলম্বনে কেন সম্পন্ন হইয়া উঠুক না, আমি তাহাতে দর্শক মাত্র হইতে পারি, আমি তাহার মত কার্য্য করিতে পারিব না। আমি যে পিতার ঔরসে জন্মিয়াছি তাহার

* প্রাচীন সমাজে যে এই বামাজাতীয় অধীনতা একেবারেই ছিল না এমত বলা যাইতে পারে না।

বৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে যদি আমি না পারি তবে আমার স্বাধীন কার্য্য-শক্তি কোথায়? শৈশব হইতে পিতৃ-ব্যবসায়ে আমাকে অভ্যস্থ হইয়া আসিতে হইবেই হইবে। ঘোর জাতীয় অধীনতার মধ্য হইতে কি কখন স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে?

এতপ্রকার অধীনতায় থাকিয়া ভারতবাসিগণের মনে কখন স্বাধীনতা-ভাব সঞ্চারিত হয় নাই। যাহাকে ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা বলে, যাহাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলে, যাহাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে, তাহার কোন প্রকার স্বাধীনতা যে ভারতবাসিগণের কখন ছিল না, এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। আজি মিল যে বক্তিগত-স্বাধীনতা শিক্ষা দেন,—যাহা সামাজিক স্বাধীনতা-ভাবের স্ফূর্ত্তি ও ফল, তাহা ভারতবাসিগণ কখন স্বপ্নেও আনিতে পারিতেন না। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ইংরাজগণ জনের রাজত্ব কাল হইতে বরাবর সমান যুদ্ধ, বিগ্রহ, ও বিপ্লব করিয়া আসিতেছে, যাহার জন্য তাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া শত সমুদ্র পারে আমেরিক অরণ্যে গিয়াও বাস করিয়াছে, যাহার জন্য তাহারা স্বদেশীয় ভূপতিগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিদান দিয়াছে, যাহার জন্য তাহারা ভিন্ন-দেশীয় রাজকুমারকে স্বদেশীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, সে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সে স্বাধীনতার বিপ্লব কি কোন কালে ভারতে ঘটিয়াছিল? এই আন্তরিক স্বাধীনতার জন্য কি কখন ভারতে বিন্দুমাত্র রক্তপাত

হইয়াছে? কই ভারতীয় ইতিহাসে তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই আন্তরিক স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি না হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণতা হইতে পারে না, এবং স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না।

ভারতীয় ভূপতিগণ বিদেশীয় রাজগণের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছেন, তলিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, তাহা স্বাধীনতার জন্য নহে, তাহা স্বদেশের জন্য নহে। তাহা রাজত্বের জন্য, তাহা রাজকীয় ক্ষমতার জন্য, তাহা রাজত্বের সুখ-ভোগ জন্য, তাহা রাজত্বের বৃদ্ধি, না হয় রক্ষার জন্য। ভারতীয় সৈন্য কখন স্বাধীনতার জন্য রণমদে মত্ত হয় নাই; তাহারা চিরকাল যে রাজার লবণ খাইয়াছে, যাহার অন্নে তাহাদিগের অন্ন, যাহার স্বার্থে তাহাদিগের স্বার্থ, সেই রাজার রাজত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পূর্ণ রাজকীয় ব্যাপার, তাহাতে রাজার স্বার্থ, ও রাজার প্রয়োজন। তাহাতে সাধারণ জনগণের কোন ক্ষতি লাভ নাই, কোন স্বার্থ নাই; সুতরাং তাহাতে তাহাদিগের তাদৃশ মনোযোগও নাই। আমরা যে রাজপুতনার যুদ্ধ লইয়া এত গর্ব্ব করিয়া থাকি, তাহা কি বাস্তবিক স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ঘটিয়াছিল; রাজপুত সেনানীগণ কি স্বাধীনতার মহিমা উচ্চ রবে ঘোষিত করিয়াছিল? স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য কি সৈন্যগণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল? যাহাতে আপনাদিগের

স্বাধীনতা রক্ষা হয়, এজন্য কি সৈন্যগণ রণরয়ে ধাবিত হইয়াছিল? রাজপুত কুলাঙ্গনাগণ কি আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রণাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল? ইতিহাসে বোধ হয় কোন থানে স্বাধীনতার অক্ষর মাত্র নাই। রাজপুত ভূপতিগণ আপনাদিগের রাজত্ব ও কুলগৌরব রক্ষা করিবার জন্য মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পাছে ম্লেচ্ছগণের বশীভূত হইতে হয় বলিয়া সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধমুখে ধাবিত হইয়াছিল। যাহাতে আপনাদিগের সতীত্ব ও ধর্ম্ম রক্ষা হয় তজ্জন্য রাজপুত মহিলাগণ যুদ্ধে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া অবশেষে আপনাদিগের প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যদি আমরা বলি, রাজপুতনার যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, তাহা আমরা জোর করিয়া বলি, তাহা প্রকৃত সত্য নয়। যে হেতু স্বাধীনতার ভাব ভারতে কখন উদয় হয় নাই। ভারতে কেন, ইহা এসিয়াস্থ কোন দেশে কখন উদয় হয় নাই। যে সমস্ত দেশে রাজ-ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত, নিরঙ্কুশ, ও মুক্ত, যে সমস্ত দেশে রাজা দেবতার ন্যায় পূজ্য ও আরাধ্য হন, যেখানে রাজার একাধিপত্য, ও তাহার স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের কোন উপায় ও ব্যবস্থা নাই; যেখানে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা, যে সমস্ত দেশে সাধারণ জনগণের ও প্রকৃতিবর্গের রাজত্বে কোন অধিকার ও ক্ষমতা নাই; রাজকার্য্যে কোন হাত নাই, দেশীয় রাজকার্য্য ও ব্যবস্থায় কোন স্বত্ব নাই, যেখানে তাহারা রাজক্ষমতার প্রতিরোধ, শাসন ও দমন করিতে পারে না,

আপনাদিগের অধীনতা ক্রমশঃ বিমোচন করিতে পারে না, স্বাধীনতা কি তাহা বুঝিতে পারে না, তাহার আস্বাদ জানিতে পারে না, সে সমস্ত দেশে স্বাধীনতার ভাব কিরূপে সঞ্চারিত হইতে পারে? এসিয়াস্থ সমস্ত দেশে রাজার একাধিপত্য ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা; প্রকৃতিগণের কিছু ক্ষমতা, স্বত্ব ও অধিকার নাই; সুতরাং সেখানে কখন স্বাধীনতার ভাব সাধারণ জনগণের মনে সঞ্চারিত হয় নাই। স্বদেশীয় রাজত্বের সহিত তাহাদিগের কোন স্বার্থ নাই, সুতরাং সে রাজত্ব রক্ষার জন্য তাহাদিগের কখন প্রাণপণ চেষ্টা হয় নাই। এসিয়ার পঞ্চাশ হাজার সৈন্যবল ইয়োরোপীয় পঞ্চ সহস্র সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। যিনিই রাজা হউন না কেন তাহাতে প্রকৃতিবর্গের ক্ষতি লাভ কিছুই নাই। যে রাজার অত্যাচার কম, তাঁহাকেই তাহারা ভাল রাজা বলিয়াছে। তাহার অধীনতায় থাকিতে চাহিয়াছে। বিদেশী রাজা যদি অত্যাচারী না হন, যদি দেশীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার রক্ষা করেন, তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে তাহারা উক্তিমাত্র করিবে না। সে অধীনতায় সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিবে। যে হেতু রাজপরিবর্ত্তে তাহাদিগের অবস্থার কিছু ইতর বিশেষ হয় নাই। তাহারা এক রাজার যেরূপ অধীন প্রজা ছিল, অন্য রাজার কাছেও তাই থাকিবে। সকল রাজাকে তাহাদিগের সমান সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে, সমান সম্মান করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। রাজকার্য্যে যে

প্রজাদিগের কিছু অধিকার হইতে পারে, রাজ্যমধ্যে রাজার ক্ষমতা যেমন, প্রজারও তেমনি ক্ষমতা ও স্বত্ব থাকিতে পারে, দেশীয় রাজত্ব যে দেশসাধারণ জনগণের রাজত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে, একথা কখন স্বপ্নেও তাহাদিগের মনে উদয় হয় নাই। এ সমস্ত ভাব সম্পূর্ণ ইয়োরোপীয় ভাব। প্রাচীন গ্রীশে ইহার উৎপত্তি। প্রাচীন রোমেও ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল দেশে রাজা প্রজার প্রভু ছিল না, কিন্তু প্রজাই রাজার প্রভু ছিল। জনসাধারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজাকে রাখিত অথবা সিংহাসন-চ্যুত করিত। কত অমিতচারী ভূপতিগণ প্রজাহস্তে নিহত হইয়াছে। প্রজার স্বত্বাধিকারে একটু মাত্র হস্তক্ষেপ করিলে, রাজার আর রক্ষা থাকিত না, তাহার জীবন সংশয় হইত, রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইত। এজন্য প্রকৃতিবর্গের স্বার্থহানি করিতে কোন নৃপতি সাহসী হইতে পারিত না। দেশীয় রাজত্বে প্রকৃতিগণের এতদূর জোর, এত ক্ষমতা, এত বিক্রম ছিল। সে রাজত্বে তাহারা যত স্বাধীন, নিজে রাজা তত স্বাধীন ছিলেন না। প্রকৃতিবর্গ যে পরিমাণে রাজার অধীন তদপেক্ষা রাজা প্রকৃতিবর্গের অধীন। উভয় পক্ষই পরস্পরের অতিশয় ও অযথা বিক্রম প্রতিরোধ এবং নিবারণ করিত। উভয় পক্ষীয় ক্ষমতা সমতুলে রক্ষা হইত। রাজাকে প্রজারা বাড়িতে দিত না, প্রজাবর্গকে রাজা বাড়িতে দিত না। প্রাচীন গ্রীশ ও রোমের এই অবস্থা ছিল। আজি ইয়োরোপময় এই অবস্থা। নেপোলিয়নের

জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফরাশিগণ তাহার অনুধাবন করিয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়ান ফ্রান্সে আসিয়া যখন একাধিপত্য ও অযথা বিক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন, ফরাশিগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ ও গৌরব-রবি নেপোলিয়ানকেও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা কিছুই ভাবিলেন না। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কতবার ঘটিয়াছে। এই ইতিহাস আজি ইংলণ্ড ভারতকে প্রদান করিয়াছেন। যে স্বাধীনতার যুদ্ধ ও গৌরব ঘোষণা ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের প্রতিপত্রে স্বুবর্ণ অক্ষরে বর্ণিত আছে যে স্বাধীনতার অনুরাগে ইংলণ্ডবাসিগণ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, যাহার যুদ্ধে আজি আয়ার্লণ্ডবাসিগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পার্লেমেণ্টের মহাসভায় যে স্বাধীনতার বাক্‌যুদ্ধ প্রতিদিন চলিতেছে, সেই স্বাধীনতার ইতিহাস ইংরাজগণ আমাদিগকে মুক্ত হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের অভ্যন্তরে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সমগ্র ইয়োরোপ মণ্ডলেও সেই যুদ্ধ। এক রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যেও সেই স্বাধীনতার যুদ্ধ। সমস্ত রাজ্যের ক্ষমতা ও স্বত্বাধিকার যাহাতে সমতুলে রক্ষিত হয় ইয়োরোপ মণ্ডলে তজ্জন্য কত বৎসর ধরিয়া কত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, সমগ্র ইয়োরোপীয় ইতিহাস আমাদিগের নিকট কেবল স্বাধীনতা বিকাশের বৃহৎ ইতিহাস বলিয়া প্রতীত হয়, যে ইতিহাসের আদি প্রাচীন গ্রীশ, যাহার শেষ অনন্তকালেও হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা

ইয়োরোপে ঘটিয়াছে সমগ্র পৃথিবীতে তাহা একদিন ঘটিবার সম্ভাবনা। সমগ্র পৃথিবীতে যখন এই স্বাধীনতার যুদ্ধ বিগ্রহ আরব্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে। হায়, সে কাল কত দিনে উদয় হইবে, কতদিনে জগৎশুদ্ধ লোকে এক মহা মানব-স্বাধীনতা-রণে প্রমত্ত হইয়া আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সম্ভোগে চিরসুখী হইবে!

ইংরাজগণের ইতিহাসে, কাব্যে, সাহিত্যে, ও রাজ্য প্রণালীতে আমরা এই স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই। ইহার উজ্জ্বল আলোকে ইংলণ্ড আলোকিত রহিয়াছে। এখন আমরা শিক্ষা করিতেছি স্বাধীনতা না থাকিলে মানব জাতির সম্যক্ উন্নতি সাধন হইতে পারে না। মানব-মনের সমস্ত গুণ ও ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। মানবের যে সমস্ত স্বর্গীয় গুণ আছে স্বাধীনতা না হইলে তাহার উন্মেষণ হয় না। যে পরিমাণে মানব স্বাধীনতা পাইবে সেই পরিমাণে তাহার গুণ—গরিমার স্ফূরণ হইবে। স্বাধীন শিক্ষা নহিলে মানব-মনের উদারতা জন্মিতে পারে না, স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্র নহিলে মানবীয় ক্ষমতার সম্যক্ প্রসার ও বিকাশ হইতে পারে না। মানব-মন যেমন স্বাধীনতায় সুখে ও অবাধে বিচরণ করিতে চাহে, মানব-কার্য্যশক্তি এবং ক্ষমতাও তদ্রূপ স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করিতে চাহে। ইহা না হইলে মানবের সম্যক্ উন্নতি কখন সম্ভবে না। এই উন্নতিপক্ষে মানবের আন্তরিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই; এবং

সামাজিক, পারিবারিক, ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার একান্ত আবশ্যক। মানব যখন একবার এই স্বাধীনতার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, তখন মানব ইহার রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে পারেন।

৩। স্বদেশানুরাগ বা পেট্রিয়টিস্‌ম ভারতের ইতিহাসে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। " জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী " এ বাক্য ভারতের প্রতি উক্ত হয় নাই। ভারতবাসিগণের জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে, তাহা কোন গ্রাম, পল্লী অথবা পল্লীস্থ সেই ক্ষুদ্র-প্রসর-স্থান মাত্র যেখানে তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আমাদিগের উদাসীনেরা এক যুগের পর একদিন জন্মভূমি দেখিতে আসেন। সে জন্মভূমি কি তাহাদিগের ভূমিষ্ঠ হইবার স্থানমাত্র নহে ? যে গৃহধামে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেই গৃহধাম দেখিয়া গিয়া তাহারা সাত তীর্থের পুণ্য সঞ্চয় করে। আমরা ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে বাস করি না কেন এই জন্মভূমি ছাড়িয়া থাকিলেই সে স্থান আমাদিগের বিদেশ। সেই বিদেশের প্রতি আমাদিগের অণুমাত্র অনুরাগ নাই। যে স্বদেশানুরাগ এত সঙ্কীর্ণ সে স্বদেশানুরাগ কখন ইয়োরোপীয় পেট্রিয়টিস্‌মের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না।

যে দেশে চিরকাল অবিসম্বাদী একাধিপত্য চলিয়া আসিয়াছে, সে দেশের লোকের স্বদেশের প্রতি কত অনুরাগ জন্মিতে পারে তাহা বোধ হয় আমরা পূর্ব্বে এক প্রকার বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। রাজা ভিন্ন

দেশের উন্নতিকল্পে আর কাহার তত স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না, সুতরাং আর কাহার তত অনুরাগ জন্মিতে পারে না। এজন্য ভারতে আমরা অনেক শাস্ত্রকারের নাম শুনিয়াছি, অনেক ধর্ম্মসংস্কারকের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখন পেট্রিয়টের নাম শুনি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত পার্থিব হিতের কোন সম্পর্ক নাই, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল পরমার্থ লইয়াই ব্যস্ত। তবে ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা তদ্ব্যবসায়ীরা যে ঐহিক স্বার্থসিদ্ধি করেন তদ্ব্যতীত ইহাতে আর কোন দেশীয় সাধারণ ইষ্টসিদ্ধি দেখা যায় না। এজন্য ধর্ম্মসংস্কারকগণকে আমরা পেট্রিয়টের মহৎ নামে অভিহিত করিতে পারি না। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বরং বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া স্বদেশানুরাগের মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সংসার-ধাম তুচ্ছ করিয়া যাহারা কেবল পরমার্থ-হিতাকাঙ্ক্ষায় সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, তাহাদিগের মনে কখন স্বদেশানুরাগ জন্মিতে পারে না। অতএব কি রাজকীয় শাসন-প্রণালী, কি ধর্ম্মীয় শাস্ত্র-প্রণালী, কি ঐহিক, কি পারমার্থিক রাজ্য-প্রণালী কিছুতেই ভারতবাসিগণকে স্বদেশানুরাগী করিতে পারে নাই। ভারতবাসিগণ ভারতের প্রতি চিরকাল উদাসীন ছিল। বৈরাগ্য উপদেশক ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন ভারতে অন্য বিদ্যার তত আদর ছিল না। সুতরাং ভারতবাসিগণ বিরাগী ভিন্ন অনুরাগী হইতে পারে নাই। তাহারা পরমার্থ বিষয়ে অনুরাগী, সংসার বিষয়ে চিরকাল বিরাগী ছিল।

আদিম আর্য্যগণের মনে কখন স্বদেশানুরাগ ছিল কি না, তাহা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু দেশীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার প্রভাবে যখন তাহা আর্য্যগণের হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে, তখন তাহা পূর্ব্বে ছিল বলিয়া আর গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। যখন ইহা একবার অন্তর্ধান করিয়াছে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উন্নতিলক্ষ্মীও অন্তর্ধান করিয়াছেন। আর্য্যগণ ভারতে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়া দেখিলেন তাঁহারা চারিদিকেই ইতর জাতি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। অপর জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি সকলই নিকৃষ্ট ও পরিত্যজ্য। তাহারা নিজেই অপর জাতির আদর্শ ও শিক্ষাদাতা। অপর জাতির নিকট তাহাদিগের কিছুই শিখিবার নাই। তাঁহারা সেই গৌরবে মত্ত হইয়া অপর জাতির সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। আপনারা আর্য্যধাম ভারতের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিলেন। ভারতে যে সমস্ত আদিম অপর জাতি ছিল তাহারা আর্য্যগণের পরিত্যজ্য হইয়া বনে, ও পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আর্য্যদিগের সহিত তাহাদিগের কোন সংস্রব রহিল না। একমাত্র প্রবল জাতি আর্য্যগণই প্রভুত্ব করিতে লাগিল। তাঁহারা ভারতের প্রায় চারিদিকেই দেখিলেন সমুদ্র, একদিকে হিমাদ্রির অলঙ্ঘ্য প্রাচীর। যেদিকে কেবল বিদেশীয়গণের সহিত সংস্রব ঘটিতে পারে সে দিকে তাঁহারা নিজে নিজে এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করিলেন। সিন্ধুনদীকে সে

দিকের পরিসীমা করিলেন। তাহার পরপারে যাইলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে এই ব্যবস্থা বাহির হইল। সুতরাং আর্য্যগণ ভারতে একাকী রহিলেন। একাকী ভারত মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে তাঁহাদিগের নিঃসম্পর্কীয় ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সিন্ধু নদীর সীমার সহিত তাহাদিগের উন্নতিও সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। যাহাতে স্বদেশানুরাগ স্ফূর্তি পায় সে পথে তাঁহারা চিরদিনের জন্য কণ্টকার্পণ করিলেন। যে জাতি যত নিঃসম্পর্কীয় হইবে তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ ততই শীতল হইয়া আসিবে। অপর দেশের সহিত সংশ্রব না রাখিলে স্বদেশের প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি হয় না। অপরের সহিত প্রতিযোগিতা না থাকিলে আপনার উন্নতি পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতবাসিগণের কখন প্রতিযোগিতা ঘটে নাই। যেহেতু ভারতের প্রতিযোগী দেশ কখন নিকটবর্ত্তী ছিল না। ভারতবাসিগণ অপর দেশের কোন সংবাদ রাখিত না। অপর দেশের সহিত তাহারা কখন সংঘর্ষেও আসে নাই। সুতরাং ভারতবাসিগণ নিতান্ত অন্ধ হইয়া আপনারাই যাহা ভাল বুঝিত তাহাই করিত। তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ যাহাতে স্ফূর্তি পাইতে পারে এমত ঘটনা শত সহস্র বৎসরেও একবার ঘটে নাই। অপর দেশের উন্নতি দেখিয়া যে স্বদেশের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিবে সে পথে তাহারা একেবারে কণ্টকার্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ রূপ অগ্নি কখন ইন্ধন পায় নাই। তাহা ক্রমে ক্রমে নির্ব্বা-

পিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এতদূর শীতল হইয়া গিয়াছিল যে, যৎকালে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় হইল তখন দৃষ্ট হইল যে, তাহা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তদভাবে যাহা ঘটিবার তাহা ভারতের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বহুকাল হইতে ভারত পরাধীন হইয়াছে। পূর্ব্বে যদি কিছু থাকে, বহুকালের দাসত্বে ভারত-বাসিগণের স্বদেশানুরাগ হৃদয় হইতে একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে। এখন স্বদেশানুরাগ ও পেট্রি-য়টিস্‌ম ভারতবাসিগণের নিকট একটী নূতন ভাব। ইংরাজগণ ও ইংরাজী সাহিত্য যাহার শিক্ষাদাতা।

প্রাচীন গ্রীশ ইয়োরোপকে স্বদেশানুরাগ শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীন গ্রীশে ইহার মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সেই মহাগ্নি ইয়োরোপময় ব্যাপ্ত হয়। প্রাচীন গ্রীশও এককালে ভারতের ন্যায় কেবল গ্রীকজাতিতে পরিপূর্ণ ও বিভক্ত ছিল। তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে গ্রীক জাতিরাই বাস করিত। এক এক গ্রীক জাতি এক এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ভারতেও এইরূপ নানা স্থলে আর্য্যগণের বিভিন্ন বিভিন্ন রাজ্য স্থাপিত ছিল। বিভিন্ন বটে কিন্তু স্বতন্ত্র নহে। আর্য্যগণের রাজ্য সমস্ত একতন্ত্র ছিল। স্পার্টা ও এথেনীয় রাজ্য প্রভৃতি গ্রীক রাজ্য সকল যে কেবল বিভিন্ন ছিল এমত নহে তাহা স্বতন্ত্রও ছিল। স্পার্টীয় ব্যবস্থাবলি ও রাজ্যশাসন-প্রণালী এথেনীয় রাজ্যতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। কিন্তু এই স্বতন্ত্র রাজ্য সকল পরস্পর নিঃসম্পর্কীয় ছিল

না। তাহারা সকলই হয় বৈরভাবে, না হয় প্রতিযোগিতায়, না হয় মিত্রতায় সম্বদ্ধ ছিল। স্পার্টা ও এথেন্সের প্রতিযোগিতায় পরস্পরের স্বদেশানুরাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। গ্রীশের শ্রীবৃদ্ধি কালীন তদ্দেশবাসিগণ বহু বহু দেশ দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীক বাণিজ্যপোত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিত। গ্রীক পণ্ডিতগণ দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানাদেশীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া আসিত। গ্রীশ কেবল স্বদেশ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তাহা পৃথিবীর সহিত নিঃসম্পর্কীয় ছিল না, তাহা ক্রমশঃ বহির্দ্দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছিল। গ্রীকেরা বিদেশের সহিত আপনাদের দেশের পৃথকত্ব বিলক্ষণ অনুভব করিত। তাহার উন্নতিকল্পে সকলই ব্যতিবস্ত ছিল। এইরূপে গ্রীশের সকল রাজ্যই উন্নতির ধূমধামে পরিপূর্ণ হইতেছিল। সর্ব্বরাজ্যই স্বদেশানুরাগে পরিপুষ্ট হইতেছিল। সকলই প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য লাভের জন্য একান্ত চেষ্টিত ছিল। ইহাই স্পার্টা, এথেন্স, করিন্থ প্রভৃতি গ্রীক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ। বিদেশের সহিত সংশ্রব থাকাতে তাহারা স্বদেশের মায়ায় বিশেষরূপে অনুবিদ্ধ হইয়াছিল। স্বদেশ তাহাদিগের কত প্রিয়তর পদার্থ তাহা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিত। বিদেশের সহিত স্বদেশের বলের পরীক্ষা করিত। এইরূপ পরীক্ষারও অনেক অবসর ঘটিয়াছিল। এই পরীক্ষাকালীন গ্রীশ স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া শতগুণ

বলে বৈরদল সমক্ষে দণ্ডায়মান হইত। বৈরদল তাহার বীর্য্য ও পরাক্রম-প্রভাবে পরাভূত হইত। ইহাতে গ্রীক-জাতির স্বদেশানুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইত। এই স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া তাহারা একদা পরস্পর প্রতিযোগিতায় পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। পিলপনিসস মধ্যে মহা গৃহ-যুদ্ধের প্রলয় বাঁধিল। ইতিহাসে তাহার ফলাফল বর্ণিত আছে।

ভারতীয় আর্য্যদিগের রাজ্যসমস্তের অবস্থা অন্যবিধ। আর্য্যজাতির রাজ্য সকল যদিও পরস্পর পৃথক ছিল বটে, কিন্তু সকলই এক তন্ত্রে আবদ্ধ। সর্ব্বদেশেই একরূপ রাজ্যতন্ত্র, ও এক প্রকার রাজ্যশাসন ছিল। এক শাস্ত্র, এক ধর্ম্ম, এক প্রকার রীতি নীতি, ও আচার ব্যবহার সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল। ভূপতিগণ সকলই স্বরাজ্য মধ্যে প্রধান বটে কিন্তু সকলই এক শাস্ত্র, এক ধর্ম্ম ও এক রীতি নীতির অধীনতা স্বীকার করিত। রাজ্যসকল অতি দূরস্থিত ছিল। পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিত না। কেহ কাহার প্রতি চাহিয়া দেখিত না। নিজ নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট ছিল। পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও বড় ঈর্ষা বৃদ্ধির কারণ ঘটিত না, কারণ, প্রায় সকলেরই অবস্থা ও ভাগ্য সমান। যদি ঘটনাক্রমে কোন এক রাজ্য কথঞ্চিৎ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিত, একবার দিগ্বিজয় করিতে পারিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত। নির্দ্ধারিত কর ব্যতীত অধীন রাজ্যের সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকিত না। একবার অবসর পাইলেই অধীন রাজ্য

সকল অমনি স্বাধীন হইয়া যাইত। পরস্পরের সহিত এই মাত্র সম্বন্ধ। ভারত ব্যতীত অন্যদেশের সহিত ভারতের কখন সম্বন্ধ ঘটে নাই। ভারতের একান্ত অভ্যুদয় কালে কোন বিদেশীয় শত্রু ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। সুতরাং ভারতকে রক্ষা করিবার ভার ভারতবাসিগণের স্কন্ধে কখন নিপতিত হয় নাই। ভারতের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় ভারতবাসিগণ কখন উৎসাহিত হয় নাই। স্বদেশের প্রচুর ধনসম্পত্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যজাত লইয়াই নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট ছিল। বহির্দ্দেশে যাইবার আবশ্যকতা হয় নাই। কোন বহির্দ্দেশীয় প্রভাব ও কারণ ভারতকে কোন অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করে নাই। ভারতবাসিগণ কখন ভারতের বাহিরে বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ অথবা বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে যায় নাই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্বপ্রণীত শাস্ত্রকলাপ ভিন্ন অন্য জ্ঞানে জ্ঞানী হয় নাই। বহুদর্শন কিরূপ ভারতবাসিগণ তাহা জানিত না। অন্যের সহিত আত্ম অবস্থার তুলনা করা কিরূপ তাহা কখন শিক্ষা করে নাই। কেবল নিজ নিজ গৃহ ও দেশ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ইহাতে কি উন্নতি হয়, না স্বদেশানুরাগের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে? পরের সহিত সম্বন্ধে না আসিলে কি কখন আপনার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে? ভারত কখন পরের সম্বন্ধে আইসে নাই, সুতরাং ভারতের স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা অবশেষে একেবারে যখন অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল তখন

ভারত যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তখন সেই অনুরাগের একদা প্রয়োজন হইল। তখন ভারতের শীতল দেহে স্বদেশানুরাগের তাপ মাত্রও নাই। ভারত আস্তে আস্তে দাসত্বের শৃঙ্খল ধারণ করিলেন।

ইয়োরোপে জনসাধারণ কতদূর স্বাধীন, তাহারা রাজার সহিত স্বদেশ মধ্যে কেমন সম স্বত্বাধিকারী, দেশ মধ্যে তাহাদিগের কতদূর ক্ষমতা তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এই কারণে কতদূর স্বদেশের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

ইয়োরোপে যখন আবার ফিউডাল ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচারিত ও স্থাপিত হইল তখন জনসাধারণের এই স্বত্বাধিকার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহারাও এক প্রকার স্বদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বা অধিকারী হইয়াছিল। ইহাতে যদিও গৃহযুদ্ধের বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের স্বদেশানুরাগেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্বদেশের ভূমির প্রতি তাহাদিগের অধিকতর স্বত্ব ও অধিকার হওয়াতে তাহারা সে স্বত্ব ও অধিকার সহজে পরিত্যাগ করিত না। এই স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার্থ তাহারা সর্ব্বদা রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকিত। এবং যাহার জন্য তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিত তাহার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইত। তাহারা স্বদেশে যে শুদ্ধ প্রভু ছিল এমত নহে, সেই স্বদেশ তাহাদিগের গৌরবের স্থল ছিল। এক এক দেশ এক এক ক্ল্যান অথবা উচ্চবংশীয়ের

দলবলের গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। সেই দেশে তাহারা সম্পূর্ণ প্রভু, তাহা তাহাদিগের বিগ্রহ ব্যাপারের ক্রীড়াস্থল, তাহা তাহাদিগের আত্মীয়, স্বজন, ও অনুগত জনগণে পরিপূর্ণ। সে দেশকে তাহারা সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিত। তাহার জন্য কতবার রক্তপাত করিয়াছে, কত শত বীরের রক্ত তাহাতে নিপতিত হইয়াছে, কত শত বীর সন্তান তাহার জন্য বিসর্জ্জিত হইয়াছে। সেই স্বদেশের দুর্গে দাঁড়াইয়া তাহারা জগৎশুদ্ধ লোককে অবজ্ঞা-দৃষ্টিতে দেখিতে পারিত। সেখানে তাহাদিগের পরাক্রম ও প্রভাব দুর্জ্জয় সিংহের ন্যায় ছিল। প্রতি পার্ব্বতীয় দেশ তাহাদিগের গৌরব প্রতিধ্বনিত করিত। প্রতি কাননে ও গৃহে বীরগান সঙ্গীত হইত। প্রতি ক্ষেত্র, প্রতি ভূমি, বীর-যশে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা এই স্বদেশের প্রতি অনুরাগে একেবারে উন্মত্ত হইয়া থাকিত। সে উন্মত্ততার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় কাহার সাধ্য? আজি যদি তুমি দেশ অধিকার কর, কালি হউক, পরশ্বই হউক তোমার দেহ খণ্ড বিখণ্ডিত হইবেক। যত দিন না স্বদেশের উদ্ধার হয়, কাহারও নিস্তার নাই, স্বদেশবাসিগণের নিদ্রা নাই। ততদিন স্বদেশানুরাগ প্রতি লোকের কাণে কাণে উৎসাহ-বাক্য বর্ষণ করিবে, প্রতি লোকের শিরায় শিরায় বল দিবে, এবং চতুর্গুণ উৎসাহে উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক এক জন স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, এবং আপনার সহিত শত জনের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যিনি

সিদ্ধি লাভ করিতেন, তিনি পেট্রিয়ট নামে চিরগৌরবে ভূষিত হইতেন। পেট্রিয়টের জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ কিরূপ, একবার এই ইয়োরোপীয় পেট্রিয়টগণের জীবনে অবলোকন কর। অবলোকন করিয়া বল, ইহাদিগের কণামাত্র পেট্রিয়টিস্‌ম যে দেশে থাকে, সে দেশের কিছু মাত্র ভাবনা নাই। এই পেট্রিয়টিস্‌ম জ্বলন্ত বহ্নি-স্বরূপ। তাহার তেজে দেশশুদ্ধ তেজীয়ান্ হয়। সে বহ্নিতে হস্তক্ষেপ করে কাহার সাধ্য ?

ইয়োরোপে এই স্বদেশানুরাগের ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে। ইহার উদ্দীপনায় এক এক বার সেনানীদল উন্মত্ত হইয়া রণরঙ্গে ধাবিত হইয়াছে। ইহার উদ্দীপনায় জনসাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া দেশের জন্য তুমুল কাণ্ড উত্থাপিত করিয়াছে। সেই ক্ষিপ্তপ্রায় লোকমণ্ডলীর উন্মত্ততা দেখিয়া রাজসৈন্য কম্পিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। সেই লোকমণ্ডলীর হস্তে কত নৃপতির শীর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, কত রাজসিংহাসন বিচূর্ণ হইয়াছে। ইয়োরোপের এক দেশে স্বদেশানুরাগের জ্বলন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে এক একবার তাহাতে ইয়োরোপশুদ্ধ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে হাজার হাজার লোকের আহুতি হইয়াছে। এবং সে বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে রুধির-প্রবাহের আবশ্যকতা হইয়াছে। এই স্বদেশানুরাগ একজনে যখন ঘনীভূত হয়, তখন তাঁহাকে পেট্রিয়ট কহে। সেই পেট্রিয়টের তেজ অপরিসীম; তাহার তেজে দেশশুদ্ধ উত্তপ্ত হইয়া থাকে।

নিপীড়নে এই স্বদেশানুরাগের ভীষণতা ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। অত্যাচার নিবারণ জন্য ইহা অসি হস্তে যুদ্ধ করে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহা দেশ শুদ্ধ জ্বালাইয়া দেয়। বীরবর নেপোলিয়ানও ইহার জ্বলন্ত বহ্নির সম্মুখে মসকাউ হইতে অপমানের সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া আসেন। ইহা গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং প্রকাশ্যে অসি হস্তে অগ্নি-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার শান্তভাবও আছে। সেই ভাবে দেখিলে ইহাকে অতি রমণীয় বোধ হয়।

স্বদেশ মধ্যে যখন শান্তি বিরাজিত থাকে, তখন স্বদেশানুরাগ অতি মঙ্গল মূর্ত্তিতে কার্য্য করিতে থাকে। কিসে দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় তখন ইহার এই চেষ্টা। এই চেষ্টাতেও ইহার প্রাবল্য কিছু ন্যূন-কল্পে প্রকাশিত হয় না। ইহার নিঃস্বার্থ ও পবিত্র ভাব এই সময়ে দেখিয়া ইহাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। বাস্তবিক যাঁহারা স্বদেশানুরাগে উত্তেজিত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা জগতে আরাধ্য হইয়া আছেন। তাঁহাদিগের ক্লেশার্জ্জিত সুখভোগে সুখী হইয়া প্রতিদিন প্রতি গৃহে প্রতি পরিবার তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় পেট্রিয়টগণের নামোচ্চারণ করিয়া লোকে শয্যা হইতে উত্থিত হয়। প্রতি পূজা-গৃহে তাঁহাদিগের নাম অর্চ্চিত হয়। তাঁহারা গৃহের দেবতা, দেশের দেবতা স্বরূপ। তাঁহাদিগের গর্ব্বে দেশ শুদ্ধ গৌরবে পরিপূর্ণ হয়।

আত্মসুখ ও আত্ম-অর্থ বিসর্জ্জন দিয়া শুদ্ধ সমাজের ও দেশের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী থাকা ইয়োরোপীয়গণের নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যব্রত। এই প্রকার নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম শুদ্ধ ইয়োরোপে চলিত দেখা যায়। সামাজিক মঙ্গল ও স্বদেশীয় মঙ্গল ইয়োরোপীয়গণের উপাস্য দেবতা। রাজ্যের সকল কার্য্য ও ব্যবস্থা এই লক্ষ্যে চালিত হয়। রাজা ও উচ্চ বংশধরগণের অবদান পরম্পরা এই লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। যখন আত্ম অর্থের সহিত এই লক্ষ্য বিরোধী হইয়া পড়ে, তখন নিজ স্বার্থ অবিলম্বে পরিত্যজ্য হয়। কত শত লোক ইহার জন্য বিপুল ধন ব্যয় করিতেছেন। কত নিঃসন্তান লোক ইহার জন্য অপরিসীম সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। কত লোক ইহার জন্য দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং কত কষ্টে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ইহার জন্য ভূপতিও সূত্রধরের কার্য্য করিয়া স্বরাজ্যকে উন্নতিপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন এবং অতুল গৌরবে উত্তোলিত করিয়াছেন। আজি রুশিয়ার উন্নতির পরিসীমা নাই।

ইয়োরোপে স্বদেশানুরাগ যে স্বদেশকে কত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছে, কত সুখ সৌকর্য্যে পূর্ণ করিয়াছে, কত দেশের কত সুখ সামগ্রী ও রত্নজাত আনিয়া স্বদেশের ভাণ্ডার পরিপূরিত করিয়াছে, কত সমৃদ্ধি রাশিতে স্বদেশকে পরিশোভিত করিয়াছে, তাহা দেখিলে মন অতুল আনন্দরসে আর্দ্র হইয়া যায়। যখন স্বদেশানুরাগকে এই সমস্ত অলঙ্কারদামে ভূষিত দেখা যায়

তখন ইহাকে কি রমণীয় বোধ হয়! এই স্বদেশানুরাগে প্রেরিত হইয়া কত ভ্রমণকারী আহ্লাদের সহিত আফ্রিকার নিবিড় অরণ্য ও মরুপ্রান্তর, এবং আমেরিকার ভয়-সঙ্কুল পার্ব্বতীয় অরণ্যানী ও বিশাল তুষারময় ক্ষেত্র ভেদ করিয়া স্বদেশের জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিতেছে। কত সিংহ-পরাক্রমধারী বেলযোনি মিশর দেশীয় মৃত্তিকা ও পূর্ব্বরাজ্যের ভগ্নাবশেষ খনন করিয়া বৃহৎ বৃহৎ অদ্ভুত দ্রব্যজাত উত্তোলিত করিয়া স্বদেশের সংগ্রহ-মন্দির শোভিত করিতেছে। কত অধ্যবসায়শীল লেয়ার্ড নিনিভার ক্ষেত্রে ভূতপূর্ব্ব রাজ্যের বিস্তার ও পরিসীমার পরিমাণ করিতেছে। কত ক্লাইব ও উল্‌ফ স্বদেশীয় সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতেছে। কত হেষ্টিংস ও র‍্যালে স্বদেশীয়গণকে রত্নভাণ্ডার ও স্বর্ণখনি দেখাইয়া দিতেছে। কত নেলসন ও ব্লেক রণতরির গৌরব সমুদ্রমাঝে বিস্তার করিতেছে। কত ওয়েলিংটন স্বদেশীয় জয়পতাকা বিদেশমধ্যে গৌরবের সহিত অধিরোপণ করিতেছে। কত ওয়ালেস, টেল, ম্যাটসিনির চিত্ত অনুরাগে অগ্নি-পরীত হইয়া নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও স্বদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিতেছে। কত বাণিজ্য-পোত বিদেশীয় রত্নজাত-পরিপূর্ণ হইয়া স্বদেশীয় ধনাগার সমৃদ্ধ করিতেছে। স্বদেশানুরাগের এই সমস্ত মহৎ কার্য্য দেখিলে মনোমধ্যে যে বিপুল আনন্দরসের সঞ্চার হয় তাহা আর কিছুতেই দিতে পারে না। মন তখন উল্লাসে বলিয়া উঠে, ধন্য স্বদেশানুরাগ, ধন্য

তোমার কার্য্যকলাপ, ধন্য তোমার প্রভাব ও মহিমা!

এই স্বদেশানুরাগ বিরহে ভারত আজি রোদন করিতেছে। এই স্বদেশানুরাগের কণামাত্র থাকিলে তাহার সম্পন্ন বিশাল রাজ্য মুসলমান যবন-হস্তে পতিত হইয়া চির-অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না। তাহার সৈন্য-বল মুসলমানের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়া বিদেশীয় ও বিধর্মী মুসলমান রাজগণের জন্য আপনাদিগের রক্তপাত করিতে অগ্রসর হইত না। তাহার নীচ সন্তানগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বদেশকে পরহস্তে ন্যস্ত করিত না। স্বদেশানুরাগ না থাকিলে মনুষ্য যে এইরূপ কত নীচ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, অধোগতির কত নিম্নতলে আনীত হয়, ভারতবর্ষ তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। ইংরাজ-রাজ্য চিরস্থায়ী হউক, ইংরাজী সাহিত্য ভারতের চারিদিকে আলোচিত হউক, ইংরাজের উচ্চ ব্যবহার ভারতবাসিগণের আদর্শস্থানীয় হউক, তাহাদিগের উচ্চ গুণ ও শিক্ষা ভারতের গ্রহণীয় হউক, তাহাদিগের মহৎ ব্যবসায় ও কার্য্যকলাপ ভারত-বাসিগণ অবলম্বন করুক, তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করুক, এই আমাদিগের প্রার্থনা ও একান্ত অভিলাষ।

৪। স্বজাতি-প্রেম ইয়োরোপীয়গণের একটী বিশেষ ধর্ম্ম ও লক্ষণ। ইহা তাহাদিগের মধ্যে এত প্রবল যে, ইহাদ্বারাই ইয়োরোপীয় জাতিসমূহ জগতীয় অপরাপর মানব জাতি হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর আর কোন জাতিতে এই বন্ধন তত সুদৃঢ় দৃষ্ট হয় না। অথবা আর কোন জাতিমধ্যে ইহা সমপ্রবল আছে কি না তাহা

অদ্যাপি পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট হয় নাই। যেহেতু, ইয়োরোপীয় জাতি ভিন্ন আর কোন জাতির বিদেশীয় অধিকার ও রাজ্য নাই। আর কোন জাতি বিদেশীয় বাণিজ্য, ব্যবসায়, ও অপরাপর কার্য্যে প্রবৃত্ত নাই। অন্যান্য জাতি সকলেই স্বদেশ মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু ইয়োরোপীয়গণ পৃথিবীর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত থাকাতে, এবং পৃথিবীর নানা দেশীয় কার্য্যকলাপে লিপ্ত থাকাতে, তাহাদিগের জাতীয় প্রেম সময়ে সময়ে অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। এমত কি, যদিও তাহারা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত আছে, শুদ্ধ যেন এই বন্ধন তাহাদিগের সকলকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে থাকে। তাহাদিগের মধ্যে যেন এক আত্মা, এক ভাব, এক সৌহার্দ্দ, এক অদ্ভুত সহানুভূতি ও অনুকম্পা সূত্রে সকলকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। কেহ কাহার পরিচিত হউক, বা নাই হউক, একজন স্বজাতীয়কে দেখিলেই অন্য স্বজাতীয়ের হৃদয় উৎফুল্ল না কাঁদিয়া উঠিবে। তাহাকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবে ও তৎপ্রতি আত্মীয়ের ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবে। স্বজাতি-প্রেমের সহিত স্বদেশীয় গৌরব মনে পড়িবে। একজন স্বজাতীয়ের অপমানে দেশ শুদ্ধ লোক অপমানিত জ্ঞান করিয়া মাতিয়া উঠিবে। এই প্রবল জাতীয় ভাব যেমন বিদেশীয় বিস্তারিত ক্ষেত্রে পরিদৃশ্যমান হয় এমত স্বদেশ মধ্যে হইতে পারে না। স্বদেশ মধ্যে স্বজাতি-প্রেমের বরং বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহার স্ফূর্ত্তি হইবার তত সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজগণ মধ্যে এই স্বজাতি-প্রেম বিশেষরূপে প্রবলতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার জীবন্তভাব আমরা প্রতি দিন তাহাদিগের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাসে আমরা অন্য শিক্ষা পাইতে পারি, কিন্তু স্বজাতি-প্রেমের শিক্ষা গ্রন্থ-নিবদ্ধ নহে। ইহা দ্রষ্টব্য বিষয়; এবং ইহার দৃষ্টান্ত জীবিতক্ষেত্রে আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করিয়া এই স্বজাতি-প্রেমের উদারতায় মোহিত হইয়াছি। এই ভাবটী যে এদেশে একেবারে নাই তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।

ভারতে এই ভাব বহুকাল বিনষ্ট হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে একদিন যখন আদিম আর্য্যগণ পঞ্চনদ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তখন তাহাদিগের যে এই ভাব ছিল না এমত বলিতে চাহি না। কিন্তু তৎপরে যখন তাহারা ভারতময় বিস্তৃত হইলেন, চারিদিকে যখন আপনাদিগের রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন তাহাদিগের ব্যবস্থা ও নিয়মাবলীই তাহাদিগের অধোগতির কারণ হইতে লাগিল। যখন তাহারা হল ধরিয়া কেবল কৃষি ব্যবসায়ে আর্য্য নামে অভিহিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন তখন তাহাদিগের মধ্যে একভাব, আর যখন তাহারা বৃহৎ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া দেশের রাজা হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে ক্রমশঃ আর এক ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাহাদিগের প্রবলতম ধর্ম্মীয় ভাব, ও উৎকৃষ্ট জাতীয় গৌরব, এবং গর্ব্বই তাহাদিগের সর্ব্বনাশের মূল। তাহাদিগের জাতি-বিভাগ এই

ধর্ম্মীয় ভাব ও গর্ব্বের ফল, এবং ইহা তাহাদিগের অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ।

এই জাতি-বিভাগের ব্যবস্থা দ্বারা যে সমস্ত কুফল ফলিয়াছে এই স্থানে তাহার সমুদায় আলোচনা হইতে পারে না। ইহা দ্বারা আর্য্যগণের স্বজাতি-প্রেমের যে একেবারে উচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাই আমরা প্রদর্শন করিতে চাহি।

এই জাতি-বিভাগ প্রণালী যতদিন ব্যবসায় ও কার্য্য-গত ছিল, অর্থাৎ যতদিন কেবল ব্যবসায় ও কার্য্য দেখিয়া যে, যে জাতিতে বিভক্ত হইবে এমত নির্ণীত হইত, ততদিন ইহাদ্বারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ এই জাতিবিভাগ কুলক্রমাগত হইয়া পড়িল। যখন ইহাতে ইতরত্ব ও ভদ্রত্বের ভাব প্রবিষ্ট হইল, তখন হইতেই যত অনিষ্টের সূত্রপাত হইল। প্রথমকার চারিবর্ণেও আর কুলান হইল না। উৎকৃষ্ট হইতে ক্রমশঃ নিকৃষ্টের পর অসংখ্য নিকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি হইল। এই নিকৃষ্টতা গর্ব্ব ও ঘৃণার চিহ্ন, ইহাতে পরস্পরের বিদ্বেষানল ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে পূর্ব্বকার চারি বর্ণের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। ক্রমে ভারত মধ্যে প্রায় সকলই ইতর জাতিতে পরিণত হইল। এক ব্রাহ্মণ সকলের উপরে বসিল। নিম্নস্থ সকল শ্রেণী-কেই সেই ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত অবজ্ঞাচক্ষে দেখিতে লাগল। ক্রমে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়গণও তন্নিম্নস্থ জাতি-দিগকে ঘৃণা করিতে লাগিল। বৈশ্যগণ উভয়েরই ঘৃণিত

হইল। আবার যখন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র মিশিয়া অসংখ্য সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হইল, তখন আর এই বিদ্বেষভাব ও ঘৃণার ইয়ত্তা রহিল না। ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিয়া, সকল সঙ্করবর্ণই আপন আপনাকেই প্রধান জ্ঞান করিত। অপর বর্ণ অস্পৃশ্য ও ঘৃণার্হ। এক জাতি অপর সকল জাতিকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। আবার এক জাতি-মধ্যেও যে সদ্ভাব ছিল, বল্লালসেন বঙ্গদেশে তাহাও বিনষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি এক জাতি-মধ্যেও আবার নানা শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দিলেন। সেই শ্রেণীমধ্যে কৌলীন্য প্রদান করিলেন। সৌভাগ্য এই, ভারতের অপরাপর দেশে বল্লালী প্রণালী মত অন্য প্রণালী চলিত নাই। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই কি যথেষ্ট নহে ?

যেখানে ঘৃণা সেখানে প্রেম কোথায় ? যাহারা পরস্পর অস্পৃশ্য ও ঘৃণার্হ তাহাদিগের মধ্যে সহানুভূতি ও অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা কি ? আবার প্রতি জাতির সহিত এক এক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্যবসায়ের অপকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতা নিবন্ধনও নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান দেখা যায়। স্বর্ণকার, কুম্ভকার ও কর্ম্মকারকে ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া থাকে। কর্ম্মকার ঈর্ষানলে জ্বলিয়া স্বর্ণকারের পাশ দিয়াও যায় না। তৈলকার, ক্ষৌরকারকে দেখিতে পারে না। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীকে ঘৃণা করে ; কিন্তু স্ববৃত্তিধারীকে শত্রু জ্ঞান করে। একজন স্বর্ণকার অন্য জন স্বর্ণকারের

সহিত ব্যবসায়ের কাজ কর্ম্ম হেতু প্রায় বৈরভাবে অবস্থিত। ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে যাজন লইয়া মহা কলহ ও পরস্পর বিদ্বেষ। কিন্তু সে কার্য্য কাহারও পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিবার যো নাই। ব্রাহ্মণকে চিরকাল যাজন-কার্য্যেই ব্রতী থাকিতে হইবে। কুম্ভকারকে চিরদিন কলসই নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কুম্ভকার ভাল কারীগর হইলেও স্বর্ণকারের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। এইরূপে জাতি মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষভাব ও বৈরভাব বিলক্ষণ সঞ্জাত হইয়াছে। কেহ কাহারও সহিত সদ্ভাবে মিলিত নাই। সদ্ভাবে মিলিত থাকা দূরে থাক, একে বরং অন্যের অনিষ্ট সাধন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। যে দেশে অধিবাসিগণের মধ্যে এত বৈরভাব, বিদ্বেষ, ও ঘৃণাভাব সে দেশে কি জাতীয় প্রেম সঞ্জাত হইতে পারে? বরং যাহা থাকে তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যায়।

এই বর্ণ-বিভাগ ব্যতীত আর এক প্রকার জাতি-বিভাগও ভারতবর্ষে সমভাবে প্রবল ছিল, ও এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষ একটী বৃহৎ দেশ, এবং ইহা নানা প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণও এক এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগের ভাষা বিভিন্ন, এবং কোন কোন বিষয়ে অল্পাংশে আচার ব্যবহারও বিভিন্ন হইয়াছে। কোন কোন স্থানে আর্য্য রীতি-নীতির সহিত ভারতের আদিম অধিবাসিগণের ম্লেচ্ছ রীতি-নীতি মিশ্রিত হইয়াছে। এইরূপ

মিশ্রিত হইয়া এক এক দেশবাসিগণকে এক এক স্বতন্ত্র জাতি করিয়া তুলিয়াছে। যদিও সর্ব্বদেশেই প্রধানতঃ আর্য্য-ব্যবহার চলিত আছে বটে, কিন্তু এক এক বিষয়ে একটু একটু প্রভেদ দেখা যায়। সেইগুলি স্থানীয় মিশ্রণ হেতু সমুদ্ভূত হইয়াছে। উৎকলের দেশাচার বঙ্গদেশাচারের সহিত কিয়দংশে প্রভিন্ন দেখা যায়। যেমন উৎকলীয় ভাষা বঙ্গ ভাষা হইতে বিভিন্ন হইয়াছে, অথচ মূলতঃ এক; তদ্রূপ এই দেশাচারও মূলতঃ আর্য্যভাবাপন্ন থাকিলেও স্থানীয় মিশ্রণে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। ইহার ফল এই যে, উৎকলবাসিগণ, বঙ্গবাসিগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় হইয়া গিয়াছে। যাহা উৎকল ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বলা গেল, এইরূপ ভারতবর্ষময় ঘটিয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষে অসংখ্য বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে। এই জাতিগণের মধ্যে কাহারও কোন সংস্রব এবং সম্বন্ধ নাই। কোন প্রকার বন্ধনে ও সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ নাই। সকলই স্বতন্ত্র। কেহ কাহার সহিত সদ্ভাব রাখিতে ইচ্ছা করে না, বরং চিরকাল অসদ্ভাবে অবস্থিত আছে। বঙ্গবাসিগণ উৎকলবাসিগণকে ঘৃণা করে। মহারাষ্ট্রীয়গণ তৈলঙ্গজাতিকে অবজ্ঞা করে। রাজপুতগণ গুজরাটীকে স্পর্শ করিতেও চাহে না। এক জন রাজপুতের কাছে মহারাষ্ট্রী যে, বাঙ্গালীও সে, এবং তৈলঙ্গবাসীও সে। তাহারা সকলকেই বিদেশী জ্ঞান করে। এইরূপ ভারতের এক দেশীয় জাতি অন্য সকল দেশীয় জাতিকে বিদেশী জ্ঞান করিয়া থাকে; এবং

চিরকাল সেইরূপ জ্ঞান করিয়া আসিতেছে। তখন তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও জাতীয়-প্রেমের কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

আমাদিগের দায়ভাগের ব্যবস্থাও দায়াদগণের মধ্যে পরম শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব সঞ্জাত করিয়া দেয়। অন্যান্য কারণেও ভারতবাসিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং বরাবর স্বতন্ত্র ছিল। কেহ কাহারও সহিত কখন সদ্ভাবে মিলিত হয় নাই। সমুদয় কারণ আমরা বলিতে চাহি না। যাহা উক্ত হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতবর্ষে কখন জাতীয় প্রেম ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ সঞ্জাত ও বর্দ্ধিত হয় নাই। বরং ক্রমশই তাহা লয়প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন এই অনুরাগের বল আমরা ইংরাজগণের ব্যবহারে দর্শন করিতেছি; দেখিতেছি— ইহা জাতীয় বলের একটী প্রধান উপকরণ। যে দেশ যত জাতীয় প্রেমে সম্বদ্ধ, সে দেশ তত বলিষ্ঠ ও দুর্জ্জয়। যে সমস্ত বন্ধনে স্বদেশ সুরক্ষিত হয়, এই বল তাহার অন্যতম। ইহা স্বদেশীয় গৌরব ও সম্মান রক্ষা করে, এবং অনুরাগের বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে। স্বদেশ এই বলে বলীয়ান্ হইয়া অন্য দেশের সমক্ষে অজেয় দুর্গস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ভারতে ইহার অভাব থাকাতে সমগ্র ভারত কখন মিলিত হইতে পারে নাই; সুতরাং তাহা মুসলমান-হস্তে পতিত হইয়াছিল *।

---

* মহম্মদ ঘোরির আক্রমণ কালে একবার কেবল

এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে চারিটী বিষয় আমরা আলোচনা করিলাম, তাহা সমুদায় বিদেশীয় ভাব ও তাহা ইংরাজগণের নিকট আমরা শিখিয়াছি। ইয়োরোপে এই কতিপয় ভাব বিদ্যমান থাকাতে ইয়োরোপ কেমন উন্নতি-শিখরে উঠিতেছে, কেমন অজেয় বলে ক্রমশই বলীয়ান্ হইতেছে, কত অতুল সমৃদ্ধি-রাশিতে সম্পন্ন ও ভূষিত হইতেছে। ইয়োরোপ আজি সুখ সম্পত্তির আকরভূমি। তাহার বল বিক্রম আর তাহাতে ধারণা হয় না। তাহা চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়িতে চাহে। তাহা একদা জগতের ভীতি, গৌরব, ও আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবাসিগণ, তোমাদিগের নিকট কি এই শিক্ষা বিফল হইবে? তোমরা যে এত অভিনিবেশ সহকারে ইংরাজগণের সাহিত্য, ইতিহাস, ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছ, তাহার উপদেশ কি গ্রহণ করিবে না? এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কবে তোমাদিগের উদ্বোধন হইবে? কবে ভারতের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে?

পৃথ্বীরাজ নিজ রাজ্য রক্ষার্থ কতিপয় রাজপুত সামন্ত একত্রিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা সমগ্র ভারতীয় কিম্বা জাতীয় অনুষ্ঠান নহে। অন্যদিকে জয়চাঁদ বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া পৃথ্বীরাজের পক্ষ হীনবল করিতে ক্রটি করেন নাই।

দ্বিতীয় চিন্তা—চরিত্র-গুণ।

মহাজনে আচরণে দেন উপদেশ—
আমরাও হতে পারি সাধু সদাচারে;
ত্যজিয়া পৃথিবী তাঁরা রেখে যান শেষ,
নিজ নিজ পদচিহ্ন কালের প্রান্তরে।”

লং ফেলো।

ভাসকোডি গামার আবিষ্কার অবধি ইয়োরোপীয় জাতির সহিত ভারতবর্ষীয়গণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর হইতে এই সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্টতর হইয়া আসিতেছে। ইয়োরোপীয়গণ বাণিজ্যের জন্য এদেশে ভিক্ষুকের মত আসিয়া ক্রমশঃ এখানকার রাজা হইয়াছেন। তাঁহারা বহুকাল ধরিয়া ভারত রাজ্য নিজ করতলস্থ করিবার জন্য পরস্পর যেরূপ বৈরতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদিগের চরিত্রের অনেক অসাধুভাব আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতে ইংরাজ জাতির বল বিক্রম বৃদ্ধি হইলে তাঁহারা অপরাপর ইয়োরোপীয় জাতিকে পরাভূত করিয়া এতদ্দেশীয় রাজন্যগণের সহিত বৈরতাসাধনে

প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে যে উদ্যোগ, সাহস, ও বীর্য্যের আবশ্যক হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। চাতুরী, জাল ও কৌশলে সমুদায় ভারতরাজ্য অধীনস্থ করিলেন। সে দিন মাত্র তাঁহারা ভারতের একাধীশ্বর হইয়াছেন। সে যাহা হউক, এই দুই শত বৎসর আমরা ইয়োরোপীয়গণের সহিত একত্রে বাস করিয়া আসিতেছি। আমরা এতকাল তাঁহাদিগের চরিত্রের অনেক অসাধুভাব লক্ষ্য করিয়াছি। গৌরাঙ্গগণকে দেখিলেই ভয়ে কম্পিত হইয়াছি। তাঁহাদিগের চরিত্রের সাধুভাব দেখিতে সাহসও হয় নাই, দেখিবার অধিক অবসরও ঘটে নাই। এক্ষণে ইংরাজ জাতি নির্ব্বিঘ্নে প্রভুত্ব করিতেছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইয়া ভারতে শান্তির রাজ্য বিস্তার হইয়াছে। এখন আমাদিগের উৎকণ্ঠা ও ভয়ের সময় বিগত হইয়াছে। সবাই নির্ব্বিঘ্নে সংসার ধর্ম্ম করিতেছে, শাস্ত্রালাপ ও বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে। পূর্ব্বকালের বিষয় এখন ভাবিতেছি; কি বর্ত্তমান আছে, কি কি মহামূল্য ধন হারাইয়াছি তাহাও সমুদায় দেখিতেছি। ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আমাদিগের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া এই মহারত্ন লাভ করিয়াছি। ইংরাজী বিদ্যালাভে একটী নূতন পৃথিবী আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। এত কাল আমরা কেবল ভারতেই আবদ্ধ ছিলাম। তাহার

কিছুই জানিতাম না। আপনাদের জন্মস্থান ব্যতীত সমুদায় পৃথিবী আমাদিগের নিকট অন্ধকারময়ী ছিল। কলম্বস এক মাত্র নূতন পৃথিবী ইয়োরোপীয়গণের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন; ইংরাজী সাহিত্য শত শত নূতন পৃথিবী আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিয়াছে। কলম্বস এক অসভ্য জাতির বিবরণ ইয়োরোপীয়গণের নিকট প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ইংরাজী সাহিত্য এক সুসভ্যতম জাতির বিষয় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিয়াছে। আমরা এই সভ্যতম জাতির চরিত্রে যে সমস্ত সদ্‌গুণের পরিচয় পাই, পৃথিবীর আর কোন জাতির চরিত্রে তাহা পাই না। যে সমস্ত সদ্‌গুণের প্রভাবে ইয়োরোপীয় জাতি পৃথিবীতে সভ্যতম জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এবং সর্ব্বজাতির অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সে সমস্ত সদ্‌গুণ ইংরাজ জাতিতেও বর্ত্তমান। আমরা সেই ইংরাজ জাতির সহবাসে এতকাল অবস্থান করিতেছি। সেই সদ্‌গুণ সমুদয় লক্ষ্য করিবার আমাদিগের শক্তি জন্মিয়াছে। এতকাল সেই জাতির সহবাসে থাকিয়া যদি আমরা তাঁহাদিগের সদ্‌গুণ সমুদায় গ্রহণ করিতে না পারি, তবে আমরা নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। তাঁহাদিগের দোষ সমুদায় গ্রহণ করিতে আমরা যেরূপ তৎপর, গুণ-ভাগ গ্রহণ করিতে যদি তদ্রূপ হইতাম, তাহা হইলে আজি আমাদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হইত। ইংরাজী সাহিত্য পাঠে এখন আমরা ইয়োরোপীয় জাতির বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিতেছি;

কিন্তু আমাদিগের সেই জ্ঞান কি কেবল জ্ঞান মাত্রই থাকিবে? সেই জ্ঞানের কি সাধুফল আমাদিগের চরিত্রে প্রকাশিত হইবে না? আমরা কি চিরকাল জড়ভাবাপন্ন থাকিব, একটু উঠিয়া হাটিয়া পৃথিবীর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব না? এই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে ইয়োরোপীয় জাতির কতদূর বলক্ষয় হইয়াছে; তজ্জন্য তাঁহারা পৃথিবীর কতদূরদেশে অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন; কষ্টের পর কষ্ট, এবং দুঃখের পর দুঃখে নিপতিত হইয়া সর্ব্বশেষে কেমন জয় লাভ করিয়াছেন—এই লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত-পাঠ যদি আমাদিগকে উদ্বোধিত করিতে না পারে, যদি আমাদিগের জড়তা অপনয়ন করিতে না পারে, যদি আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতে না পারে, তবে আমাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে। তবে আর কিছুতেই আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারিবে না। আমরা চিরকালের জন্য অধঃপাতে গিয়াছি। ইয়োরোপীয় মহাজনগণের জীবন-বৃত্ত, বিজ্ঞানের ইতিহাস, এবং আবিষ্ক্রিয়ার বিবরণ পাটে আমাদিগের এখন যত উপকার দর্শিবে, দর্শনাদির পর্য্যালোচনায় ততদূর হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত বিবরণে যাহাতে আমাদিগের অভিনিবেশ জন্মে, আমাদিগের প্রবৃত্তি ও রুচি হয়, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনাদির আলোচনা এক্ষণে কিছুকাল স্থগিত রাখা আবশ্যক। ভারতবর্ষ এই গূঢ় শাস্ত্রাদির আলোচনায় কার্য্যশক্তি হারাইয়াছে;

সে আলোচনা এখন কিছুকাল ভুলিয়া থাকা আবশ্যক হইয়াছে। এখন যাহাতে ভারতবাসিগণের কার্য্যশক্তির বৃদ্ধি হয়, যাহাতে তাহাদিগের উৎসাহের উদ্রেক হয়, যাহাতে সেই উৎসাহ কার্য্যে ও সুফলে পরিণত হয়, এক্ষণে এমত বিবরণ, ইতিবৃত্ত, ও গ্রন্থাদির আলোচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে কখন উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যে সমস্ত লোক সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা গৃহে বসিয়া কেবল সুখ সম্ভোগ করেন নাই, কেবল দুগ্ধফেণ-নিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন নাই, কেবল গৃহ-ভামিনীর অঞ্চল ধরিয়া বেড়ান নাই; কিন্তু তাঁহারা উৎসাহে পূরিত হইয়া নানা দেশে দুর্বিষহ কষ্টে পড়িয়া কার্য্য করিয়াছেন, ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করেন নাই, এমত কি অনেকে কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কলম্বস এই রূপে একটী নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; সুমহৎ পিটার কতিপয় গণ্ডগ্রাম-পূর্ণ দেশকে বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন; বিশ্ব-প্রেমিক হাউয়ার্ড পীড়িত ও আতুরের দুঃখ মোচন করিতে করিতে রুসিয়ার বিদূর প্রান্তরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

অসভ্য জাতির একটী লক্ষণ এই যে, অসভ্যেরা সাহস করিয়া কোন বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হইতে পারে না,

কার্য্যক্ষেত্রে বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইলে অমনি অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়; আর সে দিকে যাইতে চাহে না। সুতরাং তাহাদিগের অবস্থারও উন্নতি হয় না। আমরা এইরূপ অসভ্যের মধ্যে এখন গণনীয় হইয়া আছি। পূর্ব্ব-সভ্যতা আমাদিগকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছে, আমরা ক্রমশঃ বরং তাহা হইতেও অবনত হইয়াছি। পাছে কোনরূপ বিঘ্ন বিপত্তি ও কষ্ট ঘটে বলিয়া আমরা আর উন্নতির দিকে যাইতে চাহি না। যে সভ্যতার আমরা উত্তরাধিকারী হইয়াছি, তাহার গৌরব আমাদিগের নহে। আমাদিগের হস্তে বরং সে সভ্যতার অনেকাংশে বিধ্বংস ঘটিয়াছে।

অসভ্যের আর একটী লক্ষণ এই যে, সে নিজ অবস্থা সহসা পরিত্যাগ অথবা পরিবর্ত্ত করিতে চাহে না। অষ্ট্রেলিয়ার কোন শাসনকর্ত্তা একজন দেশীয় অসভ্যকে বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় সেই অসভ্য বহুকাল সভ্য হইয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ ও আহারীয় সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনেক বড় লোক তাহাকে ভাল বাসিতেন। কিন্তু কিছুকাল অতীত হইলে আবার তাহাকে অষ্ট্রেলিয়ায় আনয়ন করা হইল। স্বদেশে পদার্পণ করিয়া সে সমুদায় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিল, আম মাংস ভক্ষণের জন্য ব্যস্ত হইল, এবং সর্ব্বাংশে পুনরায় সেই অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য রূপে পরিদৃষ্ট হইল। আর একবার অষ্ট্রেলিয়ার দুইটী শিশুকে বিলাতে আনয়ন করা হয়। বারবৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সভ্য-প্রণালী

মতে যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল, তাহারাও সর্ব্বাংশে বিলাতী হইয়া গিয়াছিল। বার বৎসর পরে তাহাদিগকে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে স্বাধীন ভাবে থাকিতে বলা হইল। অমনি তাহারা পূর্ব্ব পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিল এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বজাতীয়ের মত অসভ্য নগ্ন হইয়া দাঁড়াইল।

বিঘ্ন বিপত্তিতে পড়িয়া যে স্থলে সুসভ্য জনগণ যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া উদ্ধার হয়েন, সে স্থলে অসভ্যেরা নিরাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসে। আবার অসভ্যের শারীরিক বল কিছুমাত্র ন্যূন নহে। এ দুই জনে প্রভেদ এই যে, তাহাদিগের মানসিক প্রকৃতি সমান নহে। যে মানসিক বল ও বিক্রম, যে অধ্যবসায় ও সাহস, যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সহিষ্ণুতা সহকারে একজন ইয়োরোপীয় বিঘ্ন-বিপত্তির উপর জয়লাভ করিবেন, অসভ্যেরা তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারিবে না। বৃহৎ কার্য্যের জন্য বৃহৎকায় পুরুষের আবশ্যক নাই। তজ্জন্য বৃহৎ অন্তরের প্রয়োজন। ইয়োরোপীয়েরা এই মানসিক ধর্ম্মে ভূষিত হইয়া কত অবদান-পরম্পরায় সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। যে সমস্ত মহাজনেরা এই প্রকার অবদানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা কেমন সামান্য সুখস্বচ্ছন্দতা অবজ্ঞা করিয়া একান্ত মনে সামাজিক মঙ্গলোদ্দেশে কার্য্য করিতে করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রকৃত বীর পুরুষ ও মহোদয় ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য পাত্র। তাঁহাদিগকে দেখিলেই তুমি চিনিতে

পারিবে। উৎসাহ তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গকে অগ্নিপরীত করিয়াছে। তাঁহারা দীন বেশে মহৎ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহাদিগের অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই; কিন্তু তাঁহারা উৎসাহে পরিপূর্ণ; কার্য্য-উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা চিন্তা-পরায়ণ; এবং কার্য্যের প্রতি একান্ত অভিনিবিষ্ট; ভাবনা এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা তাঁহাদিগের ললাটদেশ কুঞ্চিত করিয়াছে। তাঁহারা আতপ-তাপে ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন, নিজ হস্তে রজ্জু ধরিয়াছেন, অদ্ধ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ধূলায় ও কর্দ্দমে মহা কষ্ট ভোগ করিতেছেন। মহৎ অনুষ্ঠান তাঁহাদিগকে মহৎ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালী বাবু এত দূর অপমান স্বীকার করিতে, এত কষ্টভোগ করিতে, এবং মজুরের মত খাটিতে নিতান্ত লজ্জিত হইবেন। তিনি দিব্য কার্পেটের জুতা পরিয়াছেন, ১৫০ নম্বর সুতার দিব্য ফিন ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে বুকমস্‌লিনের কেয়ারি কাটা পিরাণ, এবং ফুলকোঁচান উড়ানি পরিধান করিয়া ও হাতে একগাছি হাল্‌কি ছড়ি লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত কোমল, অবয়ব সমস্ত গোল ও পূরিত, মুখে কামিনীর লাবণ্য প্রকাশিত হইতেছে। তিনি সেই বেশে কেশ বিন্যাস করিয়া বাহিরে বহির্গত হইয়াছেন। দেখিলে ভ্রান্তি জন্মে, কোন কামিনী পুরুষ-বেশে পুরবাসের শ্রান্তি দূর করিতে বাহিরে আসিয়াছেন। এই সুকুমার বাঙ্গালী বাবু আবার মহৎ হইতে চাহেন!

১। মানব যখন অসভ্যাবস্থায় বনে বাস করিতেন, তখন বনবাসী ভয়ঙ্কর জীব জন্তু সকল তাঁহার শত্রু ছিল। এই সমস্ত জীব জন্তুর উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে তাঁহার প্রথম বল ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি বাহুবলে উন্মত্ত হস্তীকে আপন অধীনে আনিয়াছেন, এবং ঘোটককে বাহন করিয়াছেন। কিরূপে বিড়াল কুক্কুর প্রথমে মনুষ্যের বশীভূত হয়, কিরূপে মত্ত মাতঙ্গের মত জন্তু তাঁহার অধীনে আইসে, কিরূপে বন্য হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে—এসমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত থাকিলে, তাহার অধ্যয়নে নিশ্চয় সুখবোধ হইত। মৃগয়া পূর্ব্বে নৃপতিগণের ব্যসন একটী বলিয়া গণ্য হইত। আজিও ইয়োরোপীয়গণ মধ্যে মধ্যে পশুশিকারে যাত্রা করিয়া, কখন ব্যাঘ্রকে, কখন বন্য বরাহকে বধ করিয়া আনিতেছেন। যখন পল্লীগ্রামে ব্যাঘ্রের ভয় হয়, এবং গ্রামস্থ সকল লোকে সর্ব্বদাই কম্পিত হয়েন, তখন কাহারা সাহসে ভর করিয়া সেই জনপদবাসিগণের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েন? এরূপ স্থলে গ্রামবাসিগণ কি দৌড়িয়া গিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অগ্রে সংবাদ দেন না? তাঁহারা জানেন, বাঘমারা ও বাঘের মুখে যাওয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য; এবং মাজিষ্ট্রেটের কোন ত্রুটি অথবা অত্যাচার হইলে জজ সাহেবের কাছে তাহার নালিষ করা প্রজাগণের কার্য্য। কিন্তু এমত সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অকুতোভয়ে কেমন ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, এবং তাহাকে বধ করিয়া দেশবাসিগণকে আপনার সাহস ও বিক্রমের

পরিচয় দেন। কিন্তু যাঁহাদিগের দায় ও বিপদ, তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বাঘের মুখে পাঠাইয়া "যায় শত্রু পরে পরে" ভাবিয়া নিশ্চন্ত থাকেন। যে বঙ্গদেশ নানা বন্য ভয়ঙ্কর পশুর আশ্রয়-স্থান, তাহার দেশবাসিগণের মধ্যে কয় জন সেই পশুশিকার করিতে সক্ষম আছেন? এবং কয়জনই বা উদ্যোগ করিয়া তাহাদিগের বধের জন্য অগ্রসর হয়েন? ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ অক্ষম হইলেও তাঁহারা বন্ধু বান্ধবগণকে তৎকার্য্যে ডাকিয়া আনেন, এবং যাঁহারা শিকারে সক্ষম তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। ইয়োরোপীয়গণের নিকট হইতে এই প্রকার উদ্যোগ ও সাহস কি আমাদিগের শিক্ষার বিষয় নয়? এতদিন ইয়োরোপীয়গণের সহবাসে থাকিয়া আমরা কি তাঁহাদিগের এই উদ্যোগ ও সাহস গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? আমরা বোতল বোতল মদ খাইতে শিখিয়াছি, গোমাংস অস্থি সমেত ভক্ষণ করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু বাঘ মারিবার বেলা অন্দরের জানালার ভিতর হইতে উকি মারিতেও সাহসী হই না। একজন মাতাল বলিয়াছিলেন যদি ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধটা বাড়ীর কাছে হইত, তাহা হইলে বেস জানালায় চিক ফেলিয়া মজায় মজায় যুদ্ধটা দেখিতাম। এ বাঙ্গালীর মত মেয়েমানুষের কথাই বটে।

২। ইয়োরোপীয়গণ যখন স্বদেশের অনেক দূর উন্নতি সাধন করিলেন, যখন তাঁহাদিগের জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিল, সসাগরা ধরিত্রীর অন্যান্য দেশ।

কোথায় কি আছে জানিবার জন্য যখন তাঁহারা কৌতূহল-পরতন্ত্র হইলেন, তখন তাঁহারা নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে বহির্গত হইলেন। কি কি মুখ্য অথবা গৌণ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এই কার্য্য ও অবদান পরম্পরায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহার আলোচনা করা আমাদিগের প্রয়োজন নহে। কিন্তু তাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কতদূর অধ্যবসায়, সাহস এবং সহিষ্ণুতার সহিত বিপদের মাঝে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও নিজ নিজ কার্য্যসাধন করিয়াছেন, তাহার প্রতি যাহাতে স্বদেশের লক্ষ্য ফিরে তাহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। ইহাঁরা পৃথিবীর নানা দেশ বিদেশ আবিষ্কার করিয়া যে শুদ্ধ ভূগোলের জ্ঞান-রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন এমত নহে, তদ্দ্বারা ইয়োরোপকে সর্ব্ববিষয়ে সভ্যতার চরম শিখরে উন্নত করিয়াছেন, ধনং ধান্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকার সুখের ভাগী করিয়াছেন। ইহাঁরা বাস্তবিক যেরূপ সম্মানভাজন ততদূর সম্মান আজিও ইহাঁদিগেকে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বড় বড় যুদ্ধবীর অপেক্ষাও ইহাঁরা অধিকতর সম্মানের পাত্র। কুক এবং ভ্যানকাউভার, প্যারি এবং রস, মঙ্গো পার্ক এবং আউড্‌নে, কক্রেন্ এবং হমবোল্ট—ইহাঁদিগের ধীর বীরত্ব দেখিলে রণবীরের মদমত্ত বীরত্বও লঘু বোধ হয়। রণবীর রক্ত-হস্তে পৃথিবীকে কেবল দুঃখে নিমজ্জিত করেন; কিন্তু ইহাঁরা যেখানে গিয়াছেন, সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য, উন্নতিশীল বিজ্ঞান, এবং সুখদাত্রী সভ্যতা সেই খানে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া উপস্থিত

হইয়াছে। যেখানে ইহাঁদিগের জয়পতাকা রোপিত হইয়াছে, চিরদিনের জন্য সেই দেশের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। যে উদ্যোগ, উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং প্রাণপণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা এই জয়-পতাকা রোপণের প্রধান সাধন, সেই সমস্ত মহার্ঘ গুণ-পরম্পরা যত দিন আমরা অর্জ্জন করিতে না পারিব ততদিন আমাদিগের উন্নতি নাই; ততদিন আমরা সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইব না; ততদিন আমরা জ্ঞান করিব, ইয়োরোপীয়গণ আমাদিগের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদিগের নিকট এখনও অনেক বিষয় শিখিবার আছে। যতদিন না আমরা আত্মসারতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজের এবং মানবকুলের ইষ্টসাধন জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব, ততদিন কিছুতেই আমাদিগের উন্নতি হইবে না। একদিকে স্বার্থপরতা, অন্য দিকে সামাজিক ইষ্ট;— ইহার মধ্যে সকল জাতি, সকল ব্যক্তিই অবস্থান করিতেছেন। যাঁহারা স্বার্থপর হয়েন তাঁহারা সমাজকে ভুলিয়া যান। এতকাল আমরা বরাবর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বদেশ ও সমাজকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তজ্জন্য স্বদেশ হারাইয়াছি, পথের ভিখারী হইয়াছি, অথচ আমাদিগের প্রকৃত স্বার্থ-সাধন হয় নাই। যতদিন না আমরা বুঝিতে পারিব, সামাজিক সুখই প্রকৃত স্বার্থপরতা, মানব জাতির মঙ্গলেই প্রতি ব্যক্তির মঙ্গল সাধন হয়, ততদিন আমরা যে অবনতি ও দুঃখের অধঃস্থলে নিপতিত রহিয়াছি তদ্রূপই থাকিব, আমাদিগের অণুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে না।

কাপ্তেন কক্রেন্ সাইবিরিয়ার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের এক স্থলে বলেন—"আমার খুব বিশ্বাস এই যে, মানব জীবনের অধিকাংশ দুঃখের কারণ—প্রকৃত সৎশিক্ষার অভাব, করুণাময় ঈশ্বরের পালন-গুণে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব, অধ্যবসায়ের অভাব, শ্রান্তি এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ধৈর্য্যের অভাব, এবং কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ও শ্বাস থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ-পণে কর্ত্তব্য সাধনে চেষ্টা করা বিধেয়। আমি অনেক বার অনেক কষ্টে পড়িয়াছি, অনেক দুরবস্থায় পরীক্ষিত হইয়াছি, শীতে জর জর, ক্ষুধায় কাতর এবং শ্রান্ত কলেবর হইয়া মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়াছি; কিন্তু আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমি যখন এই সমস্ত দুঃখ ক্লেশ ও বিপত্তির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি, তখন যত দূর সুখী হইয়াছি, সেরূপ কখনই হই নাই।" এই ভীমকায় ভ্রমণকারী যে অসহ্য ক্লেশে এসিয়ার উত্তরাংশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পড়িলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তিনি মঙ্গোপার্কের ভ্রমণ-রীতি অবলম্বন করিয়া একাকী সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর দারুণ শীতে নগ্ন গাত্রে নানাবিধ অসভ্য রাক্ষস জাতির মধ্য দিয়া বেয়ারিং প্রণালী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। মঙ্গোপার্ক এক দল অসভ্য লোকের হস্তে নিহত হইয়াছেন; কিন্তু এই পরম সহিষ্ণু কাপ্তেন কৌশলপূর্ব্বক রাক্ষসজাতীয় জাকুটাগণের হস্ত হইতেও উদ্ধার পাইয়াছেন। তিনি কতবার দস্যু-হস্তে লুণ্ঠিত

হইয়াছেন, তথাপি এক বস্ত্রে ক্ষুধায় কাতর হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন।

আফ্রিকার মরুভূমে এবং অরণ্য দেশে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও বৃত্তান্ত পড়িলে উৎসাহে পুর্ণ হইতে হয়। লিয়ো আফ্রিকেনস হইতে মেজর ডেনহ্যামের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত বিস্তর গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, মেজর ডেনহ্যাম একবার কাপ্তেন কক্রেণের মত ফিলাটা-জাতীয়ের একদল লোক কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হইয়া যেরূপ দুঃসহ কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি তিনি সহর্ষচিত্তে ডাক্তার আউড্‌নে এবং ক্ল্যাপার্টনের সহিত ভ্রমণ করিয়া আফ্রিকার নানা গুহ্য প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এবং তথাকার অনেক অসভ্য জাতির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণ পড়িতে পড়িতে উষ্ণপ্রধানদেশীয় অরণ্য ও মরুদেশ হইতে—একদা তুষারমণ্ডিত আমেরিকার উত্তরাংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং মনে হয় এই দুই বিপরীত দেশে বিভিন্নপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তিতেও ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারীকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তিনি সমান উৎসাহে এই দ্বিবিধ দেশেই পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছেন।

৩। নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য যেমন একদল দুঃসাহসিক ইয়োরোপীয়গণ নিরতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়াও দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, আর একদল সমোৎসাহী ইয়োরোপীয়গণ পুরাতন রাজ্য এবং নগরীর ভগ্নাবশেষ

মধ্যে দারুণ কষ্টে নানা প্রাচীন বিষয়ের সমুদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে এরূপ কার্য্যে কেহ কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই; ইদানীন্তন কালে যেমন বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছে, প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য যেমন মানবের লালসা জন্মিয়াছে, পূর্ব্বতন শিল্প কৌশলের প্রতি যেমন সভ্যজাতির অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ প্রাচীন স্থানের ভগ্নাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দশ বিদেশে বহির্গত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত বেল্‌জোনী এই মহৎ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া যেরূপ দৃঢ় অনুরাগ, উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সহিত মিশরদেশীয় প্রাচীন রাজ্যের ভগ্নাবশেষ রাশি সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠে একদা সকলেরই বেল্‌জোনীর মত কার্য্য করিতে ইচ্ছা জন্মে। ব্রিটিশমিউজিয়মে মেম্‌ননের যে প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে, তাহা বেল্‌জোনীর মহোদ্যোগে মিশর হইতে ইংলণ্ডে আনীত হইয়াছে। হোমরের শত-তোরণ-বিশিষ্ট থীব নগরীর রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ হইতে এই প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি সমুদ্ধৃত হইয়াছিল। বেল্‌জোনী নিজে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন, তিনি নিজ বাহুবলে কতিপয় আরবীয়ের সহায়তায় অনেকগুলি মিশর-দেশীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া আনিয়াছিলেন। গোর্ণুর পর্ব্বতগুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে একবার তাঁহার জীবন হারাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ইহাতে দুইসহস্র-বৎসর-সঞ্চিত প্রকাণ্ড বালুকারাশি ভেদ করিয়া তাঁহাকে ইপস্তামবুলের

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সকল স্থানান্তরিত করিয়া নৃপগণের সমাধিদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গিজার পিরামিডে প্রবেশ-পথ লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যেরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এইরূপ পরিশ্রম ও কষ্টে নিনিভার প্রস্তর সকল উত্তোলিত হয়। যে মহোদয়গণ নিনিভার ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছিলেন, যত্ন ও চেষ্টা করাই তাঁহাদিগের মহামন্ত্র ও সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায় হইয়াছিল। যত্ন ও চেষ্টা করিলে সর্ব্বার্থই সিদ্ধ হয়, তাঁহারা এই আশায় যেরূপ দুঃসহ ক্লেশ বহন করিয়া আপন আপন কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বাঙ্গালীরও শীতল শোণিত একদা উৎসাহে উষ্ণ হইয়া উঠে। এই আশায় যদি তাঁহারা উৎসাহিত ও সুরক্ষিত না হইতেন, তাহা হইলে বেল্‌জোনি, বোটা, এবং লেয়ার্ডের মত উদ্যোগী পুরুষসিংহগণকেও বিফল হইতে হইত।

৪। সভ্যতার উন্নতির সহিত ইয়োরোপীয়গণের কার্য্য-ক্ষেত্র অধিকতর বিসারিত হইয়াছে, এবং এই কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির সহিত তাঁহাদিগের উৎসাহ, বল, উদ্যোগ এবং সাহসেরও দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে ইয়োরোপীয়গণ পর্ব্বত কাটিতেছেন, বিস্তীর্ণ অরণ্যানী সমভূমি করিতেছেন, সহস্র-হস্ত-গভীর খনি খনন করিয়া খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন করিতেছেন, শত

ক্রোশ বিস্তৃত রাজপথ এবং লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করিতেছেন, বৃহৎ বৃহৎ সেতু এবং উচ্চ উচ্চ আলোক-গৃহসকল নির্ম্মাণ করিতেছেন; পৃথিবীর যে দিকে যাও এবং যে দিকে চাও, সেই দিকেই ইয়োরোপীয়গণের বাহুবল, উদ্যোগ, সাহস এবং অধ্যাবসায়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নিদর্শন সকল বিদ্যমান দেখিতে পাইবে। তাঁহাদিগের অর্ণবযান এবং লৌহ-ঘোটক সর্ব্বদেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে; উপস্থিত হইয়া উদ্যম এবং যত্নে পৃথিবীর যুগান্তর ঘটাইয়াছে। পূর্ব্বকালের সপ্ত অদ্ভুত কাণ্ড এখন আর তত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় না। ইয়োরোপীয়গণের উদ্যোগে, পৃথিবীর চারিদিক্ শত শত অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভৌতিক সৃষ্টিকাণ্ডের ভিতর তাঁহারা আর একটী নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য বুদ্ধি, অসামান্য কৌশল এবং অপরিমিত উদ্যোগ সাহস, ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে।

ভারতেরও এক সময়ে সকলই ছিল। তাহারও উৎসাহ ছিল, বল ছিল, সাহস, যত্ন সকলই ছিল। তাহারও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি-কলাপ তাহার সর্ব্বগাত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তাঁহার এই সমস্ত গুণ ছিল, তখন তাহার স্বাধীনতা, বল, বীর্য্য সকলই ছিল। ব্রাহ্মণ-গণের একাধিপত্যে তাহার সকলই গেল। তাঁহাদিগের নিপীড়নে সর্ব্বত্র মূর্খতা পরিব্যাপ্ত হইল। সামাজিক অধীনতায় তাহার বল, বীর্য্য সকলই গেল; এবং ভারত কেবল ব্রাহ্মণ-সেবায় নিরত হইলেন। সেই অবধি

ভারত একেবারে অধঃপাতে গেলেন। এখন ভারতের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিলে আমাদিগের লজ্জা বোধ হয়। আমরা কি সেই আর্য্যজাতি যাঁহাদিগের সংকীর্ত্তিকলাপ ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য এবং উদ্যোগিতার পরিচয় দিতেছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা কি অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি! কত উচ্চপদ হইতে কত অধস্তলে নিপতিত হইয়াছি! কি শোচনীয়, কি লাঞ্ছনীয় আমাদিগের অবস্থা! হায়, স্বাধীনতার সহিত আমরা সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি! অথবা ঐ সমস্ত গুণ গিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা-লক্ষ্মীও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! এক্ষণে ভারতের পূর্ব্বতন অবস্থা আমাদিগের বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহার পূর্ব্বতন ইতিহাস আমাদিগের সর্ব্বদাই অধ্যয়ন করা আবশ্যক। আবশ্যক এই জন্য যে, আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবে আত্মাকে পূর্ণ করিয়া ভাবিব,—যে আর্য্যজাতি এককালে আত্ম-গরিমায় পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই আর্য্যজাতির শোণিত আমাদিগের শিরায় অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে, সেই আর্য্যজাতির মনীষা আমাদিগের অন্তরে অবস্থান করিতেছে। আমরা এতকাল মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম। এখন আমরা সেই মোহনিদ্রা হইতে উত্থান করি, উত্থান করিয়া নব বলে এবং নব উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া কীর্ত্তিকলাপের গৌরবে আর একবার পৃথিবীকে চমৎকৃত করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বদেশয়ী সমাজ।

তৃতীয় চিন্তা—সামাজিক অবস্থা।

"জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধুপানে ধায়, ফিরাব কেমনে।"

"Each nobler aim, represt by long control,
Now sinks at last, or feebly mans the soul;
While low delights succeeding fast behind,
In happier meanness occupy the mind."

আমার স্মরণ হয়, কোন লেখক এক স্থলে শ্লেষ করিয়া বলিয়াছেন, যে ইংরাজগণ যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তখন তাঁহাদিগের চিহ্নস্বরূপ ভারতে আর কিছুই থাকিবে না, কেবল রাশি রাশি বোতল ভারতের সর্ব্বত্র পড়িয়া থাকিবে। এই বোতল ব্যতীত ইংরাজগণ কি ভারতে আর কিছুই আনেন নাই? ইংরাজগণ ভারত হইতে রাশি রাশি ধনসম্পত্তি পাইয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহারা ভারতকে যে একটী মহার্ঘ রত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমুদায় ভারতবর্ষের রত্নের সহিত তুল্য-মূল্য হয় না। সে রত্ন পাশ্চাত্য বিদ্যা, পশ্চাত্য ভাব, এবং পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব। এই বিদ্যাদানে তাঁহারা সমুদায় মৃতপ্রায় ভারতবর্ষকে নবজীবনে জীবিত করিয়াছেন। কতকাল ধরিয়া, কত যুগ ধরিয়া, ভারতবর্ষ সুষুপ্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। মুসলমানদিগের

বিদ্যা বুদ্ধি ভারতকে জাগরিত করিতে পারে নাই। কারণ, সে বিদ্যা বুদ্ধি আমাদিগের প্রাচ্য ভাবে পরিপূর্ণ। তাহাতে এমত কিছুই নাই যাহাতে অচেতনকে চেতন করিতে পারে। তাহাতে এমত কিছুই ছিলনা, যাহা ভারতবাসিগণ নূতন বলিয়া শিখিতে পারেন। পরীর গল্প, সামান্য সামান্য নীতিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর উপন্যাস ভিন্ন মুসলমানগণের বিদ্যায় আর কিছুই ছিলনা। মুসলমানগণের বিদ্যা ও বুদ্ধিতে এমত কিছুই ছিল না যাহাতে তাহারা সকল বিষয় তলিয়া বুঝিতে পারে। পাশ্চাত্য বিদ্যায় সেই ভাব আছে। তাহাতে আত্মচিন্তা আছে, সকল দিক্ বুঝিয়া বিবেচনা আছে, পরের অবস্থার সহিত আপনার অবস্থার তুলনা করিবার শক্তি আছে। তুলনা ও আত্মচিন্তা করিয়া, উচিতমত ব্যবস্থা এবং নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার শক্তি আছে। এ বিদ্যার যে আন্তরিক বল আছে, তাহা প্রাচ্যপ্রভাব অতিক্রম করিতে বিলক্ষণ সমর্থ; বরং সেই বল ভারতে এক নূতন শক্তি প্রদান করিয়াছে। ভারত তৎপ্রভাবে নীয়মান হইতেছে। বিলাসী ভারত ইংরাজগণকে ভারতীয় করিতে পারেন নাই, বরং নিজেই ইংরাজী হইয়া যাইতেছেন।

এই বিদ্যা শিক্ষায় আমরাও আত্মচিন্তা শিক্ষা করিতেছি। আমাদিগের এক্ষণকার অবস্থা কি, ভাবিয়া দেখিতেছি। কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। কি কি প্রভাবে আমরা অধঃপাতে গিয়াছি, ও দুর্ব্বল হইয়াছি, বুঝিতে পারিতেছি। দেখিতেছি, আমাদিগের

দুর্ব্বলতা এত অধিক যে তাহা বিমোচন করিবার আমাদিগের সামর্থ নাই। সামাজিক হীনতার এত নীচ গর্ত্তে পড়িয়া রহিয়াছি, যে উচ্চদিকে চাহিতেও ভয় হয়, নিরাশ হইতে হয়। এখন সন্তাপ হয়, কেন এ আত্মদৃষ্টি জন্মিয়াছিল। আবার আহ্লাদ হয়, আমাদিগের এই আত্মদৃষ্টি জন্মিতেছে। আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমাদিগের দুর্ব্বলতা ও নির্বীর্য্যতা ভাবিয়া নিতান্ত নিরুদ্যম এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। ভাবি, পড়িয়াছি ত, বিলক্ষণ পড়িয়াছি, উঠিব কি প্রকারে? উঠিবার ইচ্ছা মাত্র হয়, একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখি, চাহিয়া একবার শিরোত্তলন করিতে যাই, আবার কোথা হইতে কোন্ প্রভাব আসিয়া নিস্তেজ ও দুর্ব্বল শিরোদেশকে বসাইয়া দেয়। পুনরায়, সেই অধস্তলেই মুহ্যমান হইয়া পড়ি। এইরূপ শোচনীয় আমাদিগের অবস্থা! শোচনীয় আমাদিগের দুর্ব্বলতা! শোচনীয় আমাদিগের অধঃপতন!

এই অধঃপতন হইতে কি নিস্তার নাই? তবে আমাদিগের এ অবস্থা জন্মিবার ফল কি? পাশ্চাত্য বিদ্যা ও ভাবের প্রভাব ত এরূপ নয়? তাহা সমুদায় শরীরকে উৎসাহিত করে, শিরে শিরে উৎসাহ-শক্তি প্রদান করে, নব বলে সমুদয় হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া দেয়। বারম্বার চেষ্টা করিতে বলে, সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া উপায় নির্দ্ধারন করিতে বলে, কি কি কারণে বিফল হইতেছি তাহা অনুসন্ধান করিতে বলে, এবং অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় প্রতিবন্ধকতার

প্রতিবিধান করিতে বলে। চিন্তাতে উৎসাহ দেয়, কার্য্যে উৎসাহ দেয়, এবং নিরুৎসাহিতাকেও একদা উৎসাহিত করিয়া তুলে। এই প্রভাব ভারতবাসিগণের অন্তরে যতকাল অবস্থান করিবে, ততকাল নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমাদিগের অধঃপতন নিতান্ত গভীর, শক্তি নিতান্ত অল্প, সুতরাং সকল চেষ্টাই বিফল হয়। হয় ত কি কি কারণে আমরা বিফল হইতেছি তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। নির্ণীত হয় নাই বলিয়া তৎ-প্রতিকারোপযোগী উপায়ও অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে। অতএব আমাদিগের এই হীনাবস্থার উন্নতি সাধন করিতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, কি কি কারণে আমরা বারম্বার বিফল হইতেছি। কেন আমাদিগের সকল চেষ্টা ও যত্ন শিথিল হইয়া যাইতেছে?

এক্ষণে বঙ্গসমাজে দুইটী স্রোত চলিতেছে। এই স্রোতদ্বয় পরস্পর প্রতীপগামী। এক স্রোত সমাজের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে; অন্যতর স্রোত ইহার অভ্যন্তর দিয়া গোপনে গোপনে বিপরীত দিকে বহিয়া যাইতেছে। উপরের প্রবাহ যে দিকে সমাজকে আকৃষ্ট করে, নিম্নগামী প্রবাহ তদ্বিপরীতদিকে সমাজকে লইয়া যায়। সুতরাং উপরস্থ প্রবাহের বল ও প্রভাব নিম্নস্থ প্রবাহের বল ও প্রভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গ সমাজের গতি এজন্য নিতান্ত মন্দীভূত হইয়াছে।

ইংরাজী সাহিত্য পাঠে যদি আমরা কোন অমূল্য

ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহা স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীনতার সুমহৎ ভাব। যে "স্বাধীনতা কয়েদীর সুখের স্বপন, যাহা করিব উদ্বোধন শক্তি, উৎসাহ ও উন্মত্ততা" সেই স্বাধীনতার ভাব যখন বঙ্গবাসীর মনে ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতে লাগিল, বঙ্গবাসিগণ তখন যেন এক সুরলোকের ঈষৎ আভা দেখিতে পাইলেন। তাহার হৃদয় মন সেই আলোকে আলোকিত হইল, উৎফুল্ল হইল, উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তদবধি নিতান্ত বাসনা, কিরূপে সেই স্বাধীনতার সুখভাগী হন। মনের ইচ্ছা সেইদিকে ধাবিত হইল, অন্তরের মহৎভাব সমুদায় সেই দিকে উদ্রিক্ত হইল। যে অধীনতার ঘোর নিগড়ে বঙ্গদেশ আবদ্ধ, তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য বাঙ্গালীর একান্ত বাসনা জন্মিল। সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে যে উপায় আবশ্যক তাহা স্থিরীকৃত হইল। সমাজের জন্য স্বার্থ-ত্যাগ, সাধারণ উন্নতির জন্য একতা, এবং আত্ম-বলে পরবশতা পরিবর্জ্জন না করিতে পারিলে প্রকৃত স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত হইবে না। ইংরাজী শিক্ষা ও সাহিত্য আমাদিগকে সেই স্বাধীনতারই দিন দিন প্রয়াসী করিতেছে, তাহার মূল্য ও সুখ আমাদিগের কল্পনা-চক্ষে দিন দিন বর্দ্ধিত এবং স্পৃহনীয় করিতেছে। তজ্জন্য স্বদেশানুরাগ মনে মনে ফুলিয়া উঠিতেছে। ইচ্ছা, যত্ন তজ্জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। মনের সকল ভাব ও সকল চেষ্টা, সেই উদ্দেশে উৎসাহিত ও প্রয়োজিত হইয়াছে। এই ভাবের স্রোত বঙ্গসমাজের

উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আশার প্রসন্ন বায়ু অনুকূল থাকিয়া স্রোতোবেগ প্রতাড়িত করিয়া দিতেছে। ইহার জন্য কত লোক কত সাধু অনুষ্ঠানে রতী হইয়াছেন। কত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কত স্বদেশানুরাগীর উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। কত বাগ্মীর উন্মত্ত হৃদয় অগ্নিপরীত বাক্যে সময়ে সময়ে সমাজকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। কতবার কত কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্য আমাদিগের হৃদয়ে যে সমস্ত মহৎভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা কত চেষ্টা করিতেছি। তজ্জন্য আমাদিগের হৃদয় কেমন স্ফীত হইয়া উঠে। বাস্তবিক ইংরাজী সাহিত্য ও তৎপাঠের ফল আমাদিগের অন্তরকে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রবল স্রোতে ফেলিয়াছে। সেই স্রোতে হৃদয় ভাসিতে চাহে। সেই স্রোত সমাজ, দেশ, সকলই প্লাবিত করিতে চাহে। তাহাতে পূর্ব্ব আচার, পূর্ব্ব পদ্ধতি বিনষ্ট হয়, হউক। আমরা সে আচার ও পদ্ধতির ফলাফল বিলক্ষণ দেখিয়াছি। তাহাতে আমরা হৃত-সর্ব্বস্ব ও মৃত-প্রায় হইয়াছি। আর আমরা সে সকল দেশাচার ও রীতির অনুবর্ত্তী হইতে চাহি না।

ইংরাজী সাহিত্য পাঠে আমাদিগের মন এইরূপ স্বদেশাচারের প্রতি নিতান্ত বিরাগী হইয়াছে। বিরাগী হইয়াছে এই জন্য, যে সেই দূষিত দেশাচার হেতু আমরা অতি নীচ ও অধম জাতিরূপে পরিণত হইয়াছি। বিরাগী এইজন্য, যে তাহা স্বাধীনতা লাভের পক্ষে নিতান্ত প্রতি-

বিরোধী। বিরোধী এইজন্য, যে তাহাদিগের ফলাফলক্রমে আমরা সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার বিসর্জ্জন দিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে দুই একটী রীতি নীতি ভাল থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমরা এক স্বতন্ত্র তুলায় তাহাদিগকে ওজন করিতে বসিয়াছি। এই ওজনে অনেকেরই গুরুত্ব কমিয়া যায়। স্বাধীনতা লাভের সাধন পথে যে সকল রীতি নীতি অন্তরায় স্বরূপ হইবে, তাহা কেন সহস্ররূপে মঙ্গলকরী হউক না, সেই এক কারণে তাহা নিতান্ত পরিত্যজ্য। দেশাচার, পাত্র ও কাল ভেদে পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই। আমরা যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই কালের মহৎ উদ্দেশ্য যাহা, যদ্দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়, তাহাই অবলম্বন করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য হইব না। নহিলে আমরা কর্ত্তব্য অবহেলায় দারুণ পাতকে লিপ্ত হইব। তাহার ফলাফল আমাদিগের ভবিষ্যৎ পুরুষে সম্ভোগ করিয়া আমাদিগের উপর কেবল তাহারা গালি বর্ষণ করিবে। পৃথিবী ও মানব-সমাজের পরকাল বিনষ্ট হইবে। আমাদিগের পরবর্ত্তী কাল যদি মানব জাতির প্রকৃত পরলোক হয়, তবে আমাদিগের কার্য্য-সন্তান নিশ্চয় সেই লোকে প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে *। এই পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া

* "মানবজাতির পরলোক" নামক আমি যে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহা দেখ।

আমরা প্রচলিত রীতি নীতির বিচার করিব। স্বদেশ ও সমাজের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা দেশাচারের পরীক্ষা করিব। সেই পরীক্ষায় যাহা রক্ষিত হইবে, তাহাই রক্ষণীয়, নহিলে সমুদায় বিনষ্ট করা উচিত। আর আমরা পূর্ব্বপুরুষের নামে বিকাইতে চাহি না। আমাদিগের শিরে একটী বিশেষ কার্য্যভার পড়িয়াছে। সেই কার্য্যভার অতি গুরুতর। আমরা যদি পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় মূর্খ ও অজ্ঞ হইয়া কিছু না জানিতে পারিতাম, আমাদিগের তত প্রত্যবায় হইত না। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া আমরা কিরূপে নীরব, নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি। যাহারা থাকিতে পারে তাহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহে।

বঙ্গ সমাজের শিক্ষিত জনের মনে এক্ষণে এই মহা ভাব-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তাহার আশা, ভরসা, চেষ্টা এক্ষণে এই স্রোতে নিয়োজিত হইয়াছে। ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাব তাহার মনকে এইদিকে ফিরাইতেছে। তিনি স্বাধীনতার একান্ত প্রয়াসী হইয়া সকল দেশাচার, সকল রীতি নীতি সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল কি না, এবং কতদূর উপযোগী, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন। তিনি স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়া যাহাতে বঙ্গসমাজ প্রকৃত স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। কিসে আমাদিগের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পরিলব্ধ হয়, আপাততঃ সেই উদ্দেশ্য প্রতি স্বদেশানুরাগী ও সুশিক্ষিত

জনের মনকে উত্তেজিত করিতেছে। এই বল বঙ্গসমাজের উপর এক্ষণে পতিত হইয়াছে। এই বলে যে স্রোত উত্থিত হইয়াছে, আমাদিগের আশা, এক দিন সেই স্রোত বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিবে। এই বল বঙ্গ সমাজকে ওতপ্রোত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা বঙ্গসমাজে এক দিন মহা বিপ্লব উত্থাপিত করিবে। কিন্তু সে দিনের আজিও অনেক বিলম্ব আছে। রাষ্ট্র-বিপ্লব এক দিনে সম্পন্ন হয় না। এক দিনে একটী বৃহৎ পুরাতন সমাজ আমূল তোলপাড় হয় না। এক দিনে কোন সমাজ বিপর্য্যস্ত হয় নাই, বঙ্গসমাজই বা কেন হইবে? যত দিন না এই বল বঙ্গসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, তত দিন প্রকৃত বিপ্লবের সূত্রপাত হইবে না। যত দিন আমরা প্রতি কার্য্য, প্রতি অনুষ্ঠান, প্রতি আচার ব্যবহার, প্রতি রীতি নীতি ও ভাব, স্বাধীনতা লাভের পরীক্ষা দ্বারা পরিমাণ করিতে না শিখিব, তত দিন আমাদিগের স্বাধীনতা-লাভ আশামাত্র থাকিবে। তত দিন স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত পন্থা অবলম্বিত হইবে না। কিন্তু যে দিন হইতে আমরা সেই পরীক্ষায় অগ্রে প্রতি কার্য্য বিচার করিয়া তবে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, সেই দিন হইতে সে আশা সম্পূরণ হইতে আরম্ভ হইবে। এক্ষণে তাহা হইতেছে না বলিয়া আমাদিগের আশা কেবল আশামাত্র রহিয়াছে। আমাদিগের সমাজের উপরস্থ স্রোত কেবল ভাসিয়া যাইতেছে। তাহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না

পারিলে সমাজের অন্তর নিজ বল দ্বারা ফিরিতে পারিবে না। স্রোত সমাজের শিরোদেশ দিয়া বৃথায় বহিয়া যাইবে। সমাজের সমুদায় দেহ অটল থাকিবে।

এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। এই স্রোত সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু নিম্নে আর এক তরঙ্গে সমাজ প্রচালিত হইতেছে। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের শিরোদেশ যেমন সুরলোকের জ্যোৎস্না অথবা রবিকরে হাসিতে থাকে, কিন্তু তাহাদের মধ্যদেশ যেমন কাদম্বিনী-জালের ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে এবং সময়ে সময়ে প্রবল ঝটিকায় কম্পিত হয়, বঙ্গসমাজের এক্ষণে সেই দশা। ইহার উপরে উচ্চ আশা, উচ্চ অভিলাষ বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর ও মধ্যদেশ গত নীচতায়, অধীনতায় ও নীচকার্য্যে পরিপূর্ণ। এই জন্য ইহার মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে না।

বহুকাল ধরিয়া আমরা ঘোর অধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া আছি। শুদ্ধ রাজনৈতিক অধীনতা নয়, সামাজিক ও পারিবারিক অধীনতায় আমাদিগের প্রকৃতি অতি মৃদু ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। একে এই ঘোর অধীনতায় নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া আছি, তাহাতে আমরা আবার এমত সকল ব্যবসায় ও কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছি ও করিতেছি যদ্দ্বারা সেই অধীনতার শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি হইতেছে; এবং আমরা অধিকতর মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছি। উচ্চ আশা ও অভিলাষ, আমাদিগকে উচ্চ দিকে উন্নীত করিতে চায় বটে, কিন্তু ব্যবসায় ও কার্য্য

আমাদিগকে অধোগতিতে গাঢ়তর নিমজ্জিত করিতেছে। উচ্চে উঠিতে যাইব কি, আমরা কার্য্য-গতিকে অধিকতর নামিয়া পড়িতেছি। আমাদিগের গতি নিম্নদিকে রহিয়াছে, আমরা এক এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়া উপর দিকে দৃষ্টিপাত করি মাত্র। যদি আমরা কখন এই নিম্নগতি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি, যদি আমরা কখন উর্দ্ধদিকাভিমুখে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তখন আমরা এক দিন উন্নতির আশা করিতে পারিব। নহিলে যদি কেবল নিম্নাভিমুখে যাইতে যাইতে এক এক বার উর্দ্ধদিকে ফিরিয়া চাই মাত্র তাহাতে কি গতির কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে? ঘোর অধীনতা-স্রোতের প্রভাব ও বল আমাদিগকে এইরূপ নিম্নতর অধস্তলে নামাইয়া আনিতেছে। সেই স্রোতের বিপরীত দিকে দাঁড়াই, আমাদিগের এমত বল নাই। তাহার বল অতিক্রম করিয়া বিপরীত দিকে উঠিতে যাওয়া আমাদিগের চেষ্টার অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'আমাদিগের যদি এক্ষণে কোন বীরত্বের আবশ্যক হয়, তাহা এই বীরত্ব; তাহা সামাজিক অধীনতার বল অতিক্রম করিয়া উন্নতির দিকে উঠিতে পারার বীরত্ব। এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে তবে আমরা এক দিন পুরুষ নামের উপযুক্ত হইব। এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে আমরা সর্ব্ববিধ যুদ্ধে ক্রমশঃ সমর্থ হইব। যে শত্রু অতি গোপনীয় ভাবে অদৃষ্টরূপে আমাদিগের সমূহ অনিষ্ট করিতেছে, আমরা যদি তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া

জয়ী হইতে না পারিলাম, তবে আর কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইয়া, আলস্তের শয্যায় শুইয়া, কামিনীকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্যসনে ও নৃত্যগীতে অলস হইয়া, দাসত্বে প্রভুর সেবা শুশ্রূষা করিয়া কি কখন বীরত্বের উপযোগী হইতে পারা যায়? কিন্তু আমাদিগের ঠিক এই লজ্জাকর অবস্থা! আমাদিগের আশা বটে, কিসে অধীনতার হস্ত হইতে মুক্ত হই, কিন্তু চেষ্টা কি তাই? চেষ্টা কিরূপে উচ্চ চাকরী ও দাসত্বের ঘোর নিগড়ে নিবদ্ধ হই। দেশাচার যেরূপ নৃশংসতার সহিত আমাদিগকে শাসন করিতেছে, এক এক বার তাহার বিরুদ্ধে উঠি, নিতান্ত অভিলাষ হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমোদ-প্রমোদে পরিলিপ্ত হইয়া সকলই ভুলিয়া যাই। নৃত্য ও গীতের মোহিনী শক্তিতে নির্বীর্য্য হইয়া পড়ি। সুন্দরীর রূপ দেখিয়া ঢলিয়া পড়ি। স্ত্রৈণতা, আমোদ, প্রমোদ, ভোগ ও ব্যসন আমাদিগকে দ্বিগুণতর নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য করিয়া আনিতেছে। অধীনতার নিগড় অধিকতর আবদ্ধ করিয়া দিতেছে। ভাবি,—আমাদিগের সঙ্গীত-বিদ্যা কি চমৎকার পদার্থ; ইহার আলোচনা রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন আমরা সেই সঙ্গীত-বিদ্যায় একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ি, যেন তাহাই আমাদিগের জীবনের সারকার্য্য, তখন জানি না, তাহার নিয়ত আলোচনায় আমাদিগের প্রকৃতি কত মৃদুতর ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তথাপি ইহাই আজ কালি আমাদিগের তরুণ-বয়স্কগণের একমাত্র আমোদ,

ব্যসন ও সুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যদি কোন বিদ্যার আলোচনা করেন, তাহা এই বিদ্যা—এই স্নিমোহিনী, নির্বীর্য্যকরী সঙ্গীত-বিদ্যা। কিন্তু অধুনা, এ বিদ্যার এতদূর আলোচনা যে নিতান্ত অনিষ্টকর, তাহাতে যে আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারা একদিন স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন না। এমত কি যে বিদ্যার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে গেলে অমনি খড়্গা-হস্ত হইয়া উঠেন।

সর্ব্ববিধ বিলাসিতা ও ভোগেচ্ছার এখন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদিগের তরুণ-বয়স্কগণের যদি কোন কার্য্য থাকে, আলোচনা থাকে, চেষ্টা থাকে তাহা এই ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য। তাহারা যদি কখন আলস্যের শয্যা হইতে উত্থিত হন তাহা এই ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য। এই ভোগের মৃদু স্রোত বঙ্গ সমাজকে নিয়ত তরঙ্গায়িত করিতেছে। এই পঙ্কিল স্রোত বঙ্গসমাজের অভ্যন্তর দিয়া তরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। নৃত্য, গীত, সুরা, লাম্পট্য ও আমোদ-প্রমোদের প্রবল বায়ু এই স্রোত প্রতাড়িত করিয়া দিতেছে। আমাদিগের তরুণ-বয়স্কগণ উন্মত্ত হইয়া এই স্রোতে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং স্রোতো-বেগে ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতেছেন। আজিও চৈতন্য হয় নাই, আমরা কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি। কোথায় যাওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য, আর কোন্ পথে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ

করা যে অন্যায়, তাহা আমি বলি না; তাহা একেবারে পরিবর্জ্জন করিয়া কেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু তাহাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়া, যেন তদপেক্ষা আর কোন গুরুতর কার্য্য নাই, আর কোন চিন্তা ও চেষ্টা নাই, এই আমোদ-প্রমোদে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া পড়া একান্ত দূষণীয়। তাহাতে আমাদিগকে অধিকতর স্ত্রৈণ, মৃদু-প্রকৃতি ও নির্বীর্য্য করিয়া ফেলিবে। আমরা কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িব। ইহা একালের উপযোগী নয়, এজন্য পরিত্যজ্য। কালোপযোগী নয় বলিয়া যদি কোন বিদ্যার লোপ অথবা অনিষ্ট হয়, হউক, আমরা সে নির্বীর্য্যকরী, বিমোহিনী বিদ্যার আর আলোচনা করিতে চাহি না। তাহা ক্রমশঃ আমাদিগের জীবনী-শক্তি হরণ করিতেছে। সে বিদ্যা হারাইলে তাহা পুনর্লাভ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু তাহাকে পুষিয়া রাখিয়া যে কোন মহামূল্য রত্নলাভে অকৃতকার্য্য হইব ইহা কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিবেচনাসিদ্ধ বলিবেন?

দিন দিন অধীনতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা ততই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। আমাদিগের অভিলাষ-স্রোত যে দিকে বহে, কার্য্যের স্রোত তাহার ঠিক বিপরীত দিকে যায়। এই দুই স্রোত যখন একমুখী হইবে তখন সমাজের গতি দুর্নিবার ও প্রবল হইবে। সুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় সমাজের জনকত লোক যে দিকে যাইতে চাহে, সাধারণ জনগণ অসমর্থতা হেতু সে দিকে যাইতে চাহে না। স্বদেশানুরাগী জন

গণের এখন কর্ত্তব্য এই, প্রাকৃত জনগণের আভ্যন্তরিক স্রোত ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সদভিলাষের স্রোতোমুখী করিয়া দেন। যত দিন না ইহা সম্পন্ন হইতেছে, তত দিন তাহাদিগের সকল চেষ্টা ও অনুষ্ঠান বিফল হইয়া যাইবে। সকল সমাজ আভ্যন্তরিক বলেই প্রচালিত হয়। সেই আভ্যন্তরিক বল নিয়মিত করিয়া দিতে পারিলে সমাজ আপনাপনি উন্নতির দিকে চালিত হইবে। এই বল নিয়মিত করিয়া দেওয়াই সমাজ-সংস্কর্ত্তার কার্য্য।

আমাদিগের স্বদেশানুরাগী সমাজ-সংস্কর্ত্তৃগণকে সমাজের উপরস্থ স্রোত প্রতাড়িত করিতে যত যত্নবান্ দেখা যায়, নিম্নস্থ আভ্যন্তরিক স্রোতের বিরুদ্ধে যাইতে তত দেখা যায় না। সত্য বটে, তাহারা স্বাধীনতার মধুর রবে উল্লাসিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন; এই রব চারিধারে পরিঘোষিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; এবং এই রব বঙ্গদেশের যেখানে ঘোষিত হইবে, সেখানে প্রবৃত্তি নিশ্চয় এই রবে আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে ঈষৎ আকৃষ্ট করাই কার্য্যের শেষ নহে। সেই প্রবৃত্তির রাগ ও বল কেমন কার্য্য ও অভ্যাসের শীতল প্রভাবে প্রশমিত হইয়া যায়, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা চাই। সমাজের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে তাহা জানা যাইতে পারে না। কেবল আপনিই জানিলে কার্য্যের শেষ হইল না। সমাজের দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতার কারণ যাহা, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা উচিত, এবং সেই কারণ প্রতিজনের

মনে দৃঢ় প্রতীত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগের কারণ না জানিতে পারিলে তাহার ঔষধ নির্ণীত হয় না। এজন্য প্রতিজনের জানা চাই, কি জন্য তিনি অসমর্থ ও দুর্ব্বল। যে যে কারণে আমরা অসমর্থ ও দুর্ব্বল, আমাদিগের আজিও কাহার তাহা জ্ঞান নাই। সে দিকে চিন্তা ও ভাবনাই নাই। কেবল মুখে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া বেড়াই মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে কি আমরা স্বাধীনতার অভিলাষী হইয়াছি? তাহা বোধ হয় নহে। তাহা যদি হইত, আমরা প্রতি কার্য্য, প্রতি প্রবৃত্তি, প্রতি দেশাচার, প্রতি রীতি নীতি, প্রতি অভিলাষ, চিন্তা ও ভাব সেই তুলে পরিমাণ করিতাম। স্বাধীনতা-লাভই যদি আমাদিগের একমাত্র বাসনা হইত, তাহা হইলে আমরা সকল বিষয় অগ্রে সেই উদ্দেশ্য ধরিয়া পরীক্ষা করিতে শিখিতাম। তাহা কি আমরা করিয়া থাকি? যত দিন না ততদূর করিতে পারিব, যতদিন না কেবল তন্মন হইব, ততদিন জানিব আমরা আজিও স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রকৃষ্ট রূপে উদ্যোগী হই নাই। যতদিন না আমরা আত্মানুসন্ধান করিয়া প্রতি কার্য্য-প্রবৃত্তি এই স্রোতোমুখী করিয়া দিব, ততদিন আমাদিগের সকল চেষ্টা ও যত্ন বৃথা হইয়া যাইবে। এক সমাজে দুই বিপরীত স্রোত কখনই প্রবল হইতে পারিবে না। এক স্রোত আর এক স্রোতকে নিশ্চয় ফিরাইয়া দিবে।

চতুর্থ চিন্তা—উদ্বোধন।

সরোবরে পদ্মিনী ভাসিতেছে অগ্রে দেখিলাম। দেখিবামাত্র লালসা জন্মিল পদ্মিনীকে তুলিয়া আনি। লালসার পর সন্তরণ দিয়া পদ্মিনীকে তুলিয়া আনিলাম। এখানে দেখা যাইতেছে, অগ্রে দর্শন-শক্তি দ্বারা মনে জ্ঞানের উদয় হইল, জ্ঞানের পর লালসা, এবং লালসার পর কার্য্য। এইটী কার্য্যের স্বাভাবিক নিয়ম। কার্য্যের পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার পূর্ব্বে জ্ঞান। জ্ঞান ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা নাই, আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কার্য্য নাই। একেবারে কার্য্যের কেহ প্রত্যাশা করে না। কোন কার্য্যের প্রত্যাশা করিতে হইলে অগ্রে তাহার আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করা আবশ্যক, এবং আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিতে হইলে, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ক জ্ঞানোৎপাদন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ না করিয়া যিনি অগ্রেই কার্য্য চান তিনি নিশ্চয় নির্ব্বোধ ও নিতান্ত অধীর।

অনেকে নির্জ্জীব বাঙ্গালীজাতিকে একেবারে কার্য্যশীল দেখিতে চান। যে জাতি যুগযুগান্তর ধরিয়া নিস্পন্দ, অচেতন, মৃত-প্রায় হইয়া রহিয়াছে, সে জাতি কি সহসা সঞ্জীবিত হইয়া বীর কার্য্যক্ষেত্রে একদিনে মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে? কিন্তু অনেকে এমনি অধীর যেন তাঁহাদিগের ইচ্ছা আজিই বাঙ্গালী জাতি কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সুমহৎ কার্য্য-পরম্পরা দ্বারা পৃথিবীকে যশোগৌরবে পূর্ণ করুক। এরূপ ইচ্ছা কি

কখন ফলবতী হয়? এবং ফলবতী হইল না বলিয়া যাঁহারা আবার ভগ্নোদ্যম ও নিরাশ হন, তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিব খুঁজিয়া পাই না। তাঁহারা যদি একবার মানবপ্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, এবং মনুষ্য-সমাজের ক্রমোন্নতির তত্ত্ব ও কারণ ভাবিয়া দেখেন, অবশ্য বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদিগের নৈরাশ্য অকারণ এবং অধীরতা বাতুলতা মাত্র।

দশাধিক বৎসর গত হইল, কোথায় কিছু নাই, একদা বিধবা-বিবাহের রীতি প্রচলিত করিবার উদ্যোগ হইল। বঙ্গ সমাজ তখন বিধবা-বিবাহের নাম শুনিবা মাত্র একেবারে স্তম্ভীভূত। কে যেন তাহাদিগের জাতি মারিতে আসিতেছে, তাহারা যেন এই ভয়ে জড়-সড়। সাধারণ জনগণ মূর্খতায় সমাচ্ছন্ন। চিরকাল তাহারা যে অভ্যস্ত পথে চলিয়া আসিতেছে, তাহারা সেই পথেই চলিতে জানে। চিরকাল যে পবিত্রতা ও পাপ-পুণ্যের ভাব তাহাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে, তদ্ব্যতীত অন্য ভাব সহসা তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? তাহারা কখন কোন নূতন ভাবের সঙ্গতাসঙ্গতা বিবেচনা করিয়া দেখে নাই; বিবেচনা করিয়া কখন কোন নূতন কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই; সামাজিক শাসন, ও পারিবারিক শাসন, কখন লঙ্ঘন করে নাই। জীবন, নদীর ন্যায় এক স্রোতেই চিরন্তন প্রথার প্রণালী দিয়া বহিয়াছে। কখন সে প্রণালী উলঙ্ঘন করিতে সাহস হয় নাই। রাজনৈতিক দাসত্ব,

সমাজিক দাসত্ব ও পারিবারিক দাসত্বে তাহাদিগের জীবন ঘোর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই অধীনতায় তাহাদিগকে নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, নিঃসাহস ও জড়প্রায় করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতা কি, এবং স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করায় কত সুখ, তাহা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কখন চিরন্তন প্রথার বিন্দু বিসর্গ অতিক্রম করিয়া স্বাধীন পথে দাঁড়ায় নাই। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনের ভাব তাহাদিগের মনেও কখন উদয় হয় নাই। দিবাস্বাপী বাঙ্গালী দিনে নিদ্রা যায়। যে অল্পক্ষণ জাগরিত থাকে, আহার বিহার, পরের নিন্দা, গ্রামের গোলযোগ, সামান্য সম্ভাষণ, চাষবাসের কথা, মকর্দ্দমার কথা, প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকিয়া দিন কাটায়। যাহা নিত্য করে, যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চিন্তা ও জ্ঞানের পরিসীমা। এই সীমার অতীত তাঁহাদিগের পক্ষে আর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চিন্তা, ও জ্ঞান নাই। অন্য কথা তাহারা বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না, বুঝিবার সামর্থ্যও নাই।

এই নিদ্রাতুর জড়প্রায় জাতির নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র ধরিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন না যে, শাস্ত্রানুযায়ী আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রচালিত হয় না। শাস্ত্র আমাদিগের ধর্ম্ম নহে, চিরন্তন প্রথা আমাদিগের ধর্ম্ম। চিরন্তন প্রথার বশবর্ত্তিতাই আমাদিগের নিষ্ঠা, যাগ, যজ্ঞ ও তপস্যা। হাজার শাস্ত্র দেখাইলেও বাঙ্গালী এ প্রথার বহির্দ্দেশে তিলার্দ্ধও বিচরণ করিতে

পারে না। চির-অভ্যাসের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া আজিও বাঙ্গালীর কার্য্য নহে।

এই দেখুন এই নিশ্চেষ্ট বাঙ্গালীজাতির বিষয় একজন সুলেখক কি বলিয়াছেন। "গঙ্গার শত মুখের তীর-বাসী খর্ব্বকায় বঙ্গদিগের মানস স্বদেশের ভূমির ন্যায় হিমার্দ্র ও নিস্তেজ। তাহাদিগের আন্তরিক তেজের স্ফুলিঙ্গ, দেশের সজলতা দ্বারা নির্ব্বাণ-প্রায় হইয়া থাকে। এই তেজের ইন্ধন নাই, ইহার উদ্দীপন কিছুতেই হয় না। যত পদাঘাত কর, যত ঘর্ষন কর, ইহার উষ্ণতা কখন অনুভূত হয় না।" এজাতির নিকট শাস্ত্রই কি, ধর্ম্মই কি, আর অধর্ম্মই কি? অগ্রে জিজ্ঞাস্য, সেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মাধর্ম্ম দেশের রীত্যনুযায়ী কি না? তাহা যদি না হয়, তাহা অবলম্বনীয় নহে, তদ্বিপরীত প্রথায় কেন মহাপাতক থাকুক না, কিন্তু যখন তাহা দেশে প্রচলিত আছে, তাহা সহস্রবার অবলম্বনীয় ও পরিষেব্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিশ্চেষ্ট, জড়প্রায়, চির-অভ্যাস-প্রিয়, অজ্ঞ বঙ্গজাতির নিকট শাস্ত্র ধরিলেন। যত টুলো পণ্ডিত, গ্রামের বর্দ্ধিষ্ট ও মণ্ডলগণ হাসিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, এ আবার কি? বিধবার আবার বিবাহ কি? একথা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপহাসাস্পদ হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৎপরোনাস্তি যত্ন স্বীকার ও বহুল অর্থব্যয় করিয়া দুই দশ জন নব্য সাম্প্রদায়িকের ঘরে বিধবা বিবাহ দিলেন। কিন্তু সেই

পর্য্যন্ত; আর বিধবার বিবাহ শব্দ বৎসরেও একবার শুনা যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সুমহৎ সামাজিক সংস্কার নিষ্ফল হইল কেন, যাঁহারা ইহার নিগূঢ় কারণানুসন্ধান করিতে যাইবেন, তাঁহারা স্থির বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালীজাতি এই সংস্কারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যে বাঙ্গালী জাতি সামাজিক স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রের সাগরে কখন বিচরণ করিতে জানে নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বাঙ্গালীজাতিকে একেবারে এক দিনে এই সাগরের মধ্যস্থলে আনিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি এ সাগরে কখন সন্তরণ দেয় নাই, সন্তরণ জানিত না, সুতরাং অধিকাংশ লোকেই তীরবর্ত্তী হইতে চাহে নাই। যাঁহারা বুক বাঁধিয়া তীরে আসিয়াছিলেন, সাগরের মহা বিভীষিকা দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। আর শীঘ্র এ তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। অগ্রে তাঁহারা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে সন্তরণ শিখুন, অগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার-ক্ষেত্রে স্বাধীন, চিন্তাশীল, ও কার্য্যশীল হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করুন, তবে বৃহৎ ব্যাপারে ও বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন। যে শিশুর পদে উঠিবার বল হয় নাই, সে শিশু কি দৌড়িতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ শিশুকে দৌড়িতে বলিয়াছিলেন। সে শিশু দৌড়িতে পারিবে কেন? সুতরাং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইল না।

প্রকাশ্য সামাজিক কার্য্য-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির কতদূর কার্য্য করিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তাহা বিধবা-বিবাহের উদ্যোগে বিশিষ্ট-রূপে প্রতীত হইয়াছে। তবু আমাদিগের সামাজিক কোন শাসনকর্ত্তা নাই। সমাজ যাহা বুঝিয়া ঠিক করিতে পারে, তাহা অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হইতে পারে; তাহার প্রতিবন্ধক কেহ নাই। তথাপি বঙ্গবাসিগণ স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে সাহসী হয় না কেন?

সামাজিক স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বঙ্গবাসি-গণের মনে স্বাধীনতার ভাব উদিত হওয়া আবশ্যক। আজিও স্বাধীনতার জ্ঞান বঙ্গবাসীর মনে কিছুই উদ্রিক্ত হয় নাই। স্বাধীনতা কি অমূল্য নিধি, যত দিন না সাধারণ জনগন সকলেই বুঝিতে পারিবে, যত দিন না তাহাদিগের হৃদয়ে স্বাধীনতা-প্রিয়তা স্বতঃই উদ্রিক্ত হইবে, ততদিন বঙ্গসমাজ নিশ্চেষ্ট, অসাড়, ও নির্জ্জীব হইয়া থাকিবে। সমাজসংস্কার-পক্ষে যে সমস্ত মহৎ ভাবের প্রচারের আবশ্যক, আজিও সে সমস্ত ভাব সর্ব্বসাধারণে অবগত নহে। বঙ্গসমাজ আজি পর্য্যন্ত কেবল আমোদ-প্রমোদে অতিবাপিত করিতেছে। কয় জন স্বাধীনতা, স্বদেশ-প্রিয়তা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাবলম্বন প্রভৃতি উচ্চ ভাবাদির আলোচনা করিয়া থাকেন? আজিও অনেকের জ্ঞান নাই, কিসে স্বদেশের অবমাননা হয়, কিসেই বা তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয়। বঙ্গজাতি কেন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত সাধারণ জনগণ আজিও নিতান্ত লজ্জাকর কার্য্য সমূহে

ব্রতী হইয়া সমস্ত সভ্য সমাজের উপহাসাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বদেশীয়গণ দ্বারাই দেশের যত অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এবং আজিও সাধিত হইতেছে, তত অপর জাতীয়গণ দ্বারা সাধিত হয় নাই, হইতেও পারে না। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যে এই সমস্ত সাধারণ জনগণের মনে, তাহারা যে কি করিতেছে, আজিও এমত বিবেচনা ও জ্ঞানের উদয় হয় নাই। কোন্ কার্য্যে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, কিসেই বা তাহাকে কলঙ্কপাত হয়, তদ্বিষয়ে আজিও সাধারণ্যে কিছুই সংস্কার নাই। সাধারণ্যে এই সমস্ত ভাব প্রচারিত হইতে বহুকাল যাইবে। কিন্তু এই সমস্ত ভাব প্রচারের জন্য কয় জন ব্রতী হইয়াছেন? শিক্ষিত জনগণের মধ্যে যাহারা উচ্চ ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয় জন সেই সমস্ত উচ্চ ভাব, ও উচ্চ অভিলাষ স্বদেশ-মধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন? গণনা করিলে অঙ্গুলি মাত্রেই তাঁহারা গণনীয় হইতে পারেন। যত দিন না সর্ব্ব সাধারণে উচ্চভাব সকল সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, ততদিন তাহাদিগের নিকট হইতে সৎ-কার্য্যের প্রত্যাশা করা অবিবেচনার ফল। গ্রামে গ্রামে গিয়া দেখ, সাধারণ সমস্ত জনগণই ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। কোন সাধু ভাব, কোন উচ্চ চিন্তা তাহাদিগের মনে স্থান পায় নাই। শত সহস্র জনগণের মধ্যে এক জনও উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ভদ্র লোকের মধ্যে অর্দ্ধ-শিক্ষিতের দল অনেক। নীচ লোকের মধ্যে

শিক্ষার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং, সাধারণ জনগণ সচরাচর সামান্য কথা-বার্ত্তায় দিন যাপন করিতেছে। সেই কথা-বার্ত্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ, তন্মধ্যে উচ্চ ভাব কিছুই নাই; বরং সমস্তই নীচ ভাবের পরিচায়ক। সেই সমস্ত কথা-বার্ত্তায় বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, আজিও আমাদিগের সাধারণ জনগণ মধ্যে নীচ ভাব সকল কত প্রবল। কাহাকে নীচতা বলে এবং কিসে নীচতা হয়, আজিও অনেকের এমত জ্ঞান নাই। সকলেই স্বার্থপরতায় ও আত্ম চেষ্টায় ফিরিতেছেন। এই স্বার্থপরতার উদ্দেশে অনেকে সমাজের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধনও করিতেছেন। তাহারা হয় ত আত্মসুখ ও আত্মোন্নতির সহিত সামাজিক সুখ ও সামাজিক উন্নতির প্রভেদ জানেন না। সমাজ-সম্বন্ধে কোন কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করা তাঁহাদিগের ক্ষমতাতীত। সামাজিক ভাব আজিও তাহাদিগের মনে কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় নাই। তাঁহারা সকল বিষয় আত্ম-সম্বন্ধে ও বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধেই বিচার করিয়া পরিসমাপ্ত করেন। ভবিষ্য বিবেচনা ও সামাজিক ভাবে তাঁহাদিগের মন বিস্তৃত হয় না।

অধীনতায় আমাদিগের মন এত নীচ হইয়া গিয়াছে যে, আর আমরা অধীনতায় কোন লজ্জা বোধ করি না। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে আমাদিগের কিছুই লজ্জা বোধ নাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি কিছু সম্পন্ন হইয়া উঠেন, আমি অমনি নিশ্চেষ্ট হইয়া আস্তে আস্তে তাঁহার অধীন হইয়া রহিলাম। আমার সন্তানাদি সমগ্র পরিবার

তাঁহার গলগ্রহ হইল। তাঁহার লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করি। তাঁহার কোন বিষয়ে ত্রুটি হইলে নিন্দা করিয়া বেড়াই। তিনি আমার নিকট যেন ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটি আমার অসহ্য হয়। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের অংশে আমি স্বত্বাধিকারী।

অধীনতা আমাদিগের শুদ্ধ ব্যক্তিগত ভাব নহে, ইহা আমাদিগের জাতীয় অবস্থা। চাকরি করা ও পরের দাস হইয়া থাকা আমাদিগের জাতীয় ব্যবসায় ও জাতীয় জীবনের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতির চাকরি করা জাতীয় ব্যবসায় নহে, আর কোন জাতি এতদূর নীচ-প্রকৃতি নহে। চাকরি ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর চিন্তাও বিস্তৃত হয় না। যাহার চৌদ্দপুরুষ চাকরি ও গোলামি করিয়া আসিতেছে, সে কি অন্য দিকে চিন্তা বিস্তৃত করিতে পারে? বাল্যকাল অতীত হইয়া গেলে, জীবিকা নির্ব্বাহের কাল উপস্থিত হইলেই বাঙ্গালীর মন চাকরির দিকে যেন এক স্বাভাবিক সংস্কার প্রভাবে নীয়মান হইবে। সে প্রভাব বিধ্বস্ত করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। শতবার স্বাধীন ব্যবসায়ের শত চিন্তা উদিত হইবে, বাঙ্গালী অমনি শত সহস্র বিভীষিকা দেখিতে থাকিবেন। কিছুতেই তাঁহার মন সুস্থির হইবে না। অবশেষে চাকরি;—নিরীহ দাসত্ব ব্যবসায়। ইহাতেই মন সুস্থির হইল। শতকোটি দিন চাকরির জন্য বাঙ্গালী পরের উপাসনা ব্রতে ব্রতী হইলেন। পরের পাদলেহনে ও উপাসনায় বাঙ্গালী বিলক্ষণ পটু।

সে কার্য্যে তাঁহাকে আর শিক্ষা দিতে হয় না। সে কার্য্যে যে চাতুরী, যে নীচতার আবশ্যক, তাহা বাঙ্গালী বিলক্ষণ জানেন। চাকরি হইলে, আবার সেই চাকরি কিরূপ চাতুরী ও নীচতার সহিত রক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও বাঙ্গালী বিশিষ্টরূপে পারদর্শী আছেন। বাঙ্গালী আর কিছুর জন্য গৃহত্যাগী হইবেন না, কেবল চাকরির জন্য হইবেন। বাঙ্গালী আর কিছুরই জন্য আত্মস্বজন ও পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ও থাকিতে পারেন না, কেবল চাকরির জন্য পারেন। বাঙ্গালী কিছুতেই জাতিভ্রষ্ট হইতে স্বীকৃত হইবেন না, কেবল চাকরির জন্য হইতে পারেন। আর কিছুর জন্য বাঙ্গালীকে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বল, বাঙ্গালী তিলার্দ্ধও নড়িবেন না; কিন্তু চাকরির জন্য তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে স্বীকৃত আছেন ও বাস্তবিক তাহাই করিতেছেন। তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কি জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন?—পরের চাকরি ও দাসত্ব করিবার জন্য। তিনি ইংলণ্ডে যান, বড় চাকর হইবার জন্য। এই দাসত্ব বিশিষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বিশিষ্টরূপে শিক্ষিত হইয়া আসেন। স্বাধীন দেশে পদার্পণ করিয়া, চারিদিকে স্বাধীন ভাব বিরাজিত দেখিয়া, চারিদিকে স্বাধীন ব্যবসায়ের ধূমধাম, ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তিনি কণামাত্র স্বাধীনভাবে উদ্বোধিত হইলেন না; তাঁহার মন স্বাধীন ব্যবসায় ও স্বাধীন চিন্তায় প্রধাবিত হইল না। তিনি সে সমস্ত ভাব পরাজয় করিয়া

মস্তকে অধীনতার ভার বহন করিয়া স্বদেশে আসিলেন; আসিয়া এখানে গোলামি করিতে লাগিলেন। এখানে ইংরাজের অবজ্ঞাপাত্র হইতে আসিলেন। এখানে ইংরাজের পদসেবা ও তিরস্কার সহ্য করিতে আসিলেন। এখানে স্বদেশীয়গণকে দাসত্ব শিক্ষা দিতে আসিলেন। হায়! বঙ্গের অবস্থা কি হইবে? ধিক্ বঙ্গের সন্তানগণ!

ইহাতে প্রতীত হইতেছে আজিও অধীনতায় বাঙ্গালীর লজ্জা বোধ হয় নাই। চির-অধীনতায় তাঁহার প্রকৃতি এরূপ অসাড় হইয়া গিয়াছে, যে তিনি শীঘ্র সে জড়তা, সে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী যে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবেন, তাঁহার জড়তা ও তাঁহার অধীনতা-প্রিয়তা তৎপক্ষে ঘোর প্রতিবিরোধী হইয়াছে। যত দিন এই জড়তা ও অধীনতা-প্রিয়তা দূরীভূত না হইবে, ততদিন বঙ্গবাসিগণের অভ্যুদয় হইবে না। অধীন হইয়া কোন জাতি মহত্ত্বের সোপানে উঠিতে পারে নাই। স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন না করিলে, স্বাধীন চিন্তা সকল স্ফূরিত হয় না; অধীনতার নীচতা ও অসুখ বোধগম্য হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, অগ্রে জ্ঞান, তৎপরে ভাবসম্ভূত আকাঙ্ক্ষা, এবং সর্ব্বশেষে কার্য্য। অগ্রে বঙ্গবাসীর মনে অধীনতার নীচতা বোধগম্য হওয়া চাই, অগ্রে স্বাধীনতার সুখ ও গৌরব জ্ঞানগোচর হওয়া চাই, তৎপরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও তজ্জন্য

চেষ্টা। অগ্রে উচ্চভাব সকল জাতি মধ্যে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক, তৎপরে কার্য্যের কথা।

অতএব বঙ্গদেশ মধ্যে অগ্রে সুমহৎ ভাব সমুদায় যাহাতে সুপ্রচারিত হয় তৎপক্ষে সমাজ সংস্কর্ত্তার বিশেষ যত্নের আবশ্যক। অগ্রে মনকে ফিরান চাই, মন ফিরিলেই হৃদয় ভাববেগে পূর্ণ হইবে, এবং সেই বেগ কার্য্যক্ষেত্রে স্বতঃই প্রকাশিত হইবে। বঙ্গবাসিগণের জড়তা ও অসাড়তা অপনয়ন করিবার এই প্রধান উপায়। তাঁহাদিগের মধ্যে মহৎভাব সকল উত্তমরূপে প্রচারিত ও হৃদয়ঙ্গত হইলে কে তাঁহাদিগের ভাববেগ নিবারণ করিবে? তখন ভাগবেগ স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, ভাববেগ প্রবল হইলে স্বতঃই কার্য্যক্ষেত্রের দিকে প্রবাহিত হইবে। তখন তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগের জড়তা অপনীত করিবেন।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকেই উচ্চভাব সকলের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাহাকে জাতীয় ভাব বলে, কাহাকে স্বদেশানুরাগ বলে, তাহা অনেকেরই বিদিত নাই। প্রকৃত বীরত্ব ও পুরুষকার, আত্মমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম, গৌরব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভাব কয়জন বাঙ্গালী অবগত আছেন? এই সমস্ত উচ্চভাব দেশমধ্যে প্রচারিত হউক; সুধু পুস্তকে নয়, সুধু সম্ভাষণে নয়, বাগ্মীর অগ্নিপরীত বাক্যে প্রচারিত হউক, হৃদয়-মধ্যে সুদৃঢ় অঙ্কিত হউক, তবে তাঁহাদিগের ভাববেগ বঙ্গবাসীর হৃদয়কে প্রতাড়িত করিবে। আজি বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে এ সমস্তের কোন

ভাবই জাগরিত নাই, আমরা কিরূপে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অবদান-পরম্পরা প্রত্যাশা করিতে পারি? দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, ভ্রমণ করিয়া দেখ, বঙ্গবাসিগণ বিষম অজ্ঞানতার ঘোরে নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। কাহার মনে জাতীয় ভাবের সংস্কার মাত্রও নাই, স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগের স্ফুলিঙ্গ মাত্রও নাই। কেবল অধীনতার ভাব জাজ্বল্যমান; জড়তা ও উদাসীনতাই প্রবল।

যে মহাজনেরা বঙ্গের উন্নতির জন্য ব্যস্ত ও চিন্তা-পরায়ণ, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুন, যাহাতে এদেশ মধ্যে অগ্রে মহৎ ভাব সমুদায় সুপ্রচারিত হয়। এক্ষণে বঙ্গের বিশাল ক্ষেত্রে বাগ্মীর উৎসাহ-সূচক প্রবোধনার নিতান্ত আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গবাসিগণের মন সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, যাহাতে তাহারা এই সদ্ভাবে আকৃষ্ট হন, যাহাতে তাঁহাদিগের হৃদয়ের অধঃস্থল পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠে, যাহাতে তাঁহারা এক্ষণকার কালোচিত কর্ত্তব্য সমুদায় বুঝিতে পারেন, এক্ষণে বাগ্মীর এরূপ উত্তেজন বাক্যের নিতান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালীর পূর্ব্বকালের ভাব সকল যেরূপ ছিল, তাহাতে কেবল নীচতারই পরিচয় দেয়; তাহাতে স্বদেশানুরাগের চিহ্ন মাত্র নাই, জাতীয় ভাবের সংস্পর্শ নাই। সেই সমস্ত ভাব আজিও কিছুই উন্মূলিত হয় নাই। নীচ-শ্রেণীস্থ লোকের কথা দূরে থাক, অর্দ্ধ-শিক্ষিত ভদ্রজনগণের মুখে আজিও সেই পূর্ব্বকার ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ভাব বিষয়ে নীচ শ্রেণীস্থ জনগণ হইতে ভদ্রলোকের বড় প্রভেদ

নাই। তাঁহারা কেবল জাতিতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আর কিছু-তেই তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয় না। জাতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কেবল ব্যবসায়ে ভিন্ন। তাঁহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, যে চাকরি, যে গোলামি করিয়া বেড়ান, তাহারই গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, এবং এই গৌরবে পূর্ণ হইয়া আত্মাভিমানে আপনাদিগকে বড়-লোক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা গোলামিকেও গৌরবে পূর্ণ করিয়াছেন। তাহাকে সালের পাকড়ী, ওয়াচগার্ড, ও মহামূল্য বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সেই পাকড়ীর মধ্যে সাহেবের পদাঘাত লুকাইয়া রাখিয়া তৎপুরস্কার স্বরূপ বেতনের চাক্‌চিক্যে তাহা উজ্জ্বলিত করিয়াছেন। সমাজে মান মর্য্যাদা লাভ করিতে হইলে এই চাকরি চাই। স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে মান মর্য্যাদা নাই। বরং অনেক স্থলে তাহাতে মানের হানি হইয়া থাকে। তুমি যেরূপ লোক হওনা কেন, মূর্খ হও, পাপী হও, ঘৃণিত হও, যাই হওনা কেন, চাকরি থাকিলেই ভদ্রলোক। বাস্তবিক সকল মান মর্য্যাদা এখন সমাজ এই চাকরির উপর স্থাপন করিয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, শ্রেষ্ঠ জাতি সমুদায়কে চাকরি করিতে দেখিয়া নীচজাতীয় লোকেরাও সাধ্য হইলে আপনাপন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাকরি করিয়া ভদ্রলোক হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে স্বাধীন ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে।

যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, ক্ষমতাহীন, দীন ও দরিদ্র তাহারাই কেবল স্বজাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ক্ষমতাবানেরা ভদ্রলোক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুতরাং স্বাধীন ব্যবসায়ের একান্ত হীনাবস্থা ঘটিয়াছে। সমস্ত স্বাধীন ব্যবসায় নীচ হইতে নীচতর হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে স্বজাতীয় ব্যবসায় করাও নীচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন কালের সুব্যবস্থা সকল এক্ষণে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। যে সদুদ্দেশ্যে এই ব্যবসায় সকল বংশ-পরম্পরা-ক্রমে ধারাবাহিক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য বিফল হইতেছে। এক্ষণে বঙ্গধামে আর শিল্পের চাতুরী, কৌশল ও উৎকর্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্যবসায়, জাতীয় এবং বংশ-পরম্পরা-ক্রমে ধারাবাহিক ছিল বলিয়া, প্রাচীন কালে বঙ্গীয় শিল্প এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার গৌরবে ইয়োরোপীয় বণিক্‌গণও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন *। এক্ষণে সেই স্বাধীন ব্যবসায় সকলের গৌরব কমিয়া চাকরির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ভদ্রলোকের নীচ ভাব সকল নিম্ন শ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কোথায় বঙ্গদেশ ইয়োরোপীয় স্বাধীন বাণিজ্যের সংশ্রবে দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিবে, তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবে, না সেই ব্যবসায় সকল পরিবর্জ্জন করিয়া উৎসন্ন যাইতেছে। আজি বঙ্গদেশ যদি ব্যবসায়ী হইয়া ইংরাজী

* Vide Appendix to Dr. Robertson's Historical Disquisition concerning the Knowledge which the Ancients had of India.

বাণিজ্যের ধূমধামে মাতিয়া যাইত, নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গদেশ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইত। স্বাধীন ব্যবসায়ের গৌরব বৃদ্ধি হইত। স্বাধীন চিন্তা প্রসারিত হইত। স্বাধীন ভাব সকল উন্মেষিত হইত। সমাজ স্বাধীন ভাবে সংগঠিত হইয়া আসিত। বঙ্গবাসিগণের স্বাধীন কার্য্য-শক্তির বল বৃদ্ধি হইত। তাঁহারা একটী গণনীয় জাতি হইয়া দাঁড়াইতেন। বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হইত। এইরূপ না ঘটিয়া এক্ষণে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। স্বাধীন বৃত্তি সকল চাকরিতে লোপ পাইতেছে। সর্ব্ব সাধারণে এক্ষণে নীচ প্রকৃতির লোক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। দাস্য বৃত্তিতে সমুদায় স্বাধীন প্রবৃত্তির লোপ করিতেছেন। দাস্যকে গৌরবে পূর্ণ করিতেছেন। ক্রমে বাঙ্গালী জাতি একটী প্রকাণ্ড দাস জাতি হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালী জাতির এইরূপ গতি চলিলে আর শতাধিক বৎসর পরে বঙ্গদেশ দাসের দেশ হইয়া দাড়াইবে। এদেশে চাকরি না জুঠিলে, বাঙ্গালীরা দেশ দেশান্তরে চাকরি করিতে বহির্গত হইবেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাঙ্গালী দাসে পরিপূর্ণ হইবে। পৃথিবীতে বাঙ্গালীর নাম আর দাসের নাম এক হইয়া যাইবে।*

এই কি উন্নত ইংরাজী শিক্ষার ফল? এই কি স্বাধীন

---

* আমাদিগের একথা বলা উদ্দেশ্য নহে, যে স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিলেই বাঙ্গালী জাতি সর্ব্ববিধায়ে স্বাধীন হইবে। কিন্তু দাস্যবৃত্তির নীচতা, এবং সামাজিক ও মানসিক প্রভাব প্রদর্শন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে বাঙ্গালীজাতি অধিকতর নীচতা ও অধীনতায় নামিয়া পড়িতেছেন, এবং তাহাদিগের তেজস্বিতা ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে।

ইংরাজ জাতির সহিত সম্মিলন ও সহবাসের ফল? এই কি স্বাধীন-ভাবাপন্ন ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষার পরিণাম? বাঙ্গালী জাতি না গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষায় ভারতীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর? ইংরাজী-সাহিত্য শিক্ষার কি এই শ্রেষ্ঠতর ফল? ভারতের রাজধানীতে থাকিয়া ইংরাজী বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধূমধামে পরিবৃত থাকিয়া বাঙ্গালী কি এই ফল লাভ করিলেন? তিনি দাসত্বে কেবল নিপুণ হইলেন! এই কি বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতা! এই বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতা লইয়া তিনি আবার বড় হইতে চাহেন। আগে তিনি দাসত্ব পরিত্যাগ করুন; আগে তিনি আপনি স্বাধীন হউন; দাসের কলঙ্ক আপনার গাত্র হইতে প্রক্ষালণ করুন, তার পর সমাজকে স্বাধীন করিতে যাইবেন। তিনি নিজে যতক্ষণ চাকরি করিবেন, পরের দাসত্ব করিবেন, ততক্ষণ সমাজকে সেই দাসত্ব শিক্ষা দিবেন, এবং সেই দাস্যে ক্রমে ক্রমে অপরকে আকৃষ্ট করিবেন। আপনি স্বাধীন হউন, পরকেও স্বাধীন করিতে পারিবেন। আপনি স্বাধীন হইয়া দেশ মধ্যে উপদেশ এবং কার্য্যে স্বাধীনতা শিক্ষা দিন, আপনার অদূর-প্রসর জীবন-ক্ষেত্র মধ্যে স্বাধীনতার বীজ রোপিত করুন, নিজে স্বাধীন হউন, নিজ পত্নীকে স্বাধীন ভাবে পূর্ণ করুন, ক্রমশঃ সমাজ মধ্যে স্বাধীন ভাব আপনাপনি প্রচারিত হইবে। ইহাই কার্য্যের সোপান। ইহাই সমাজ সংস্কারের সহজ পন্থা। ইহাই উন্নতি ও স্বাধীনতার মূল।

পঞ্চমচিন্তা—উদ্যোগ।

আমার একটী পোষা পাখী ছিল, সে অনেকগুলি বুলী বলিত। আমরা যেমন ইংরাজ-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস (মনুষ্য-লিখিত সিংহের চিত্র) পড়িয়া সুথলব্ধ-ভারত-বিজয়ী ব্রিটিশ জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে একটী বীর, ন্যায়পরায়ণ জাতি বলি, ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট বলি, নন্দকুমারের নিন্দা করি, উৎকোচদাতা পলাশী-বিজয়ী ক্লাইবকে বীরাগ্রগণ্য বলি, ম্যালকল্‌মের সহিত ক্লাইবের সুকৌশলের প্রশংসা করি, নানাকে নরাধম বলি, ঝান্সীর রাণীকে অভিসম্পাত করি, রাজ্ঞী ঝিন্দুনাকে গালি দিই, এবং সিপাহী-বিদ্রোহকে ভারতের কলঙ্ক বলিয়া রাজভক্ত হই ও ইংরাজগণের নিকট হইতে মহামূল্য পুরস্কার লাভ করি; আমার পাখীটীও সেইরূপ যাহা যাহা শিখাইয়াছিলাম, তাহাই সুন্দররূপে উচ্চারণ করিয়া আমার প্রীতি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজভক্ত বাঙ্গালী জাতিকে যেমন ইংরাজগণ ভালবাসেন, আমিও তেমনি পাখীটীকে ভালবাসিতাম। একদিন অদৃষ্ট ক্রমে পাখীটী শৃঙ্খল কাটিয়া বাটীর ছাদের উপর গিয়া বসিল। ছাদে বসিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে, এমত সময়ে তাহাকে কতকগুলি কাক আসিয়া তাড়া করিল। আমি তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। পাখীটী ভাল উড়িতে পারিত না, সুতরাং সে ভূপতিত হইয়া আমাকে ধরা দিল। আমি তাহাকে

পুনরায় শৃঙ্খল-বদ্ধ করিলাম। সে আবার আমার হইল, আমার হইল বটে, কিন্তু শৃঙ্খল নির্ম্মুক্ত হইলে পাখীর তথাবিধ ভাব দেখিয়া আমার সেই অবধি মনে অনুতাপ হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, আমি তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছি বলিয়া সে আর উড়িয়া বনে যাইতে পারিল না। ইহাতে কি আমার কিছু পাতক নাই? আমি না স্বাভাবিক স্বাধীনতার অনুরাগী বলিয়া সাধারণ্যে পরিচয় দিই? আমি না আত্ম-স্বাধীনতা লাভের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হই? পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পরিস্থাপনের জন্য সকলকে উত্তেজন বাক্যে উদ্বোধন করি? কিন্তু গৃহে একটী বিহঙ্গকে অকারণ অধীন করিয়া রাখিয়াছি। তবে যাহার বল আছে, সে আমাকে কেন অধীন করিবে না? বাস্তবিক যদি আমি স্বাধীনতার অনুরাগী হইয়া থাকি, তবে একটী বিহঙ্গেরও স্বাভাবিক স্বাধীনতা হরণ করা আমার উচিত নহে। সেই বিহঙ্গের অধীনতার চিত্রে আমার মন নীচগামী হইয়া যাইবে। আমি সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম বিহঙ্গকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু আবার ভাবিলাম, ছাড়িয়া দিলেই সে কি তৎক্ষণাৎ বনচারী হইতে পারিবে। তবে সে যখন আপনাপনি শৃঙ্খল-বিমুক্ত হইয়াছিল, বনে যাইতে পারে নাই কেন? শৈশবাবধি শৃঙ্খল-বদ্ধ থাকিয়া তাহার উড়িবার শক্তি গিয়াছে; গৃহ মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া এক্ষণে অনন্ত আকাশ দেখিলে সে ভয় পায়। অধীনতায় তাহার প্রকৃতি বাঙ্গালীর প্রকৃতির

ন্যায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে সহসা বনে যাইতে পারিবে না। যাহাতে তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হয়, অগ্রে এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া আমার প্রিয় পক্ষীকে একদিন তরুর নিকট লইয়া গেলাম। পক্ষী সেই বৃক্ষ দেখিয়া বরং ভয় পাইল, সে কোন মতে দাঁড় ছাড়িল না। চারি দিন পরে সে দাঁড় ছাড়িয়া একটী নিকটস্থ শাখায় বসিল। কিয়দ্দিন পরে সে এক শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া যাইতে চাহে। আমি তাহার শৃঙ্খলে দড়ী বাঁধিলাম। পাখী উড়িয়া একটী শাখার অগ্রভাগে আসিয়া বসিল। বসিয়া যেন উড়িতে চাহে। আমি তাহার দড়ী লম্বা করিয়া দিলাম। সে সেই বৃক্ষ হইতে নিকটস্থ আর একটী বৃক্ষে উড়িয়া যাইতে চাহে; আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, সে স্বচ্ছন্দে সেই বৃক্ষান্তরে আসিয়াছে। তখন তাহাকে আবার বাড়ীতে লইয়া গেলাম। এখন সে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে চাহে না; কেবল উড়িয়া যাইতে চাহে। তখন আমি তাহার শৃঙ্খল কাটিয়া দিলাম। সে অনায়াসে সেই বৃক্ষে উড়িয়া গেল। আমি তাড়া দিলাম, সে বৃক্ষান্তরে পলাইয়া গেল। সেখানেও তাড়া দিলাম, ডাকিলাম; ডাক শুনিল না; সে তখন তাহার স্বাভাবিক ডাক ডাকিতে ডাকিতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া গেল।

এই বিহঙ্গের দৃষ্টান্তে আমি শিখিলাম, স্বাধীনতাই, স্বাধীনতার প্রসূতি ও শিক্ষাদাত্রী। যে চিরকাল অধীন

অবস্থায় অবস্থিত, সে সহসা কখন একদিনে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না। যে বঙ্গবধূ চিরকাল গৃহমধ্যে আবদ্ধা, তিনি একদিনে কখন স্বাধীন সমাজ মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারেন না। যে ব্রিটনেরা চারি শত বৎসর রোমানদিগের অধীনস্থ ছিলেন, রোমানেরা সহসা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তখন তাঁহাদিগকে অপর জাতির অধীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আজি যদি ইংরাজগণ সহসা ভারতবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া যান, ভারতবাসিগণ কখনই একদিনে স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আবার বিষম গণ্ডগোল ও অরাজকতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। অরাজকতা উপস্থিত হইবে সত্য, কিন্তু সেইরূপ অরাজকতায় স্বাধীন ভাবে দাঁড়াইতে না শিখিলে তাঁহারা কখন স্বাধীন হইতে পারিবেন না। তীরে বসিয়া যিনি সন্তরণ-কৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া জলে ঝাঁপ দিবেন, তিনি নিশ্চয় জলমগ্ন হইবেন। কিন্তু যিনি সহস্র বার জলমগ্ন হইয়া সন্তরণ-কৌশল জলে পড়িয়া শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই মহানন্দে তরঙ্গ কাটিয়া তীরে উঠিতে পারেন। যে কোন বিষয়েই হউক, একদিনে কার্য্যশক্তি উৎপন্ন হয় না; কার্য্যশক্তির উৎপত্তির নিয়ম এই যে, তাহা কার্য্য ব্যতীত আর কিছুতেই জন্মিতে পারে না। জ্ঞান ও ইচ্ছা কার্য্যশক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়া দেয়, কিন্তু কার্য্য ও অভ্যাস কার্য্যশক্তিকে বলবতী করে। জ্ঞান ও

ইচ্ছা কার্য্যের পূর্ব্বভাব মাত্র; কার্য্যই কার্য্যের স্থায়িত্ব বিধান করে।

অধীনতাভাব বাঙ্গালী জাতির কতদূর অভ্যস্ত ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা বিগত প্রসঙ্গে অনেকদূর প্রদর্শন করিয়াছি। আত্মনির্ভরের ভাব বাঙ্গালীজাতি মধ্যে একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপনার উপর নির্ভর করিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করা বাঙ্গালীর সাধ্যাতীত। স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যাবসায়ে বাঙ্গালীর হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্ত বিপদ বোধ হয়। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি হাজার মার্জ্জিত হউক না কেন, সে বুদ্ধি নিজ কার্য্যে নিয়োগ করিতে তাঁহার ভরসা হয় না। পরের চাকরি করিয়া তিনি সেই বুদ্ধি, কিরূপ কৌশলে চাকরি রক্ষা করিতে হয় তাহাতেই প্রদর্শন করিবেন। পরে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন, বাঙ্গালী তাঁহার দাস হইয়া থাকিবেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, আমি দাসত্বে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিব, আমি সর্ব্বপ্রধান চাকর হইব। তিনি কোন মতে চাকরির গণ্ডী অতিক্রম করিবেন না। এই চাকরি করিয়া তাঁহার প্রকৃতি এরূপ নীচ হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্চাশা ও উচ্চাভিলাষ সমুদায় নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। সে উচ্চাশা ও উচ্চাভিলাষ যদি কখন জাগরিত হয়, তাহা চাকরির জন্য। পরের শত সহস্র তিরস্কার তিনি অম্লানবদনে সহ্য করেন। আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদাকে তিনি একেবারে জলাঞ্জলি

দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে যে সকল উক্তি ও যেরূপ ব্যবহার এবং হতাদর সহ্য করিতে হয়, আত্ম-মর্য্যাদার স্ফুলিঙ্গ মাত্র থাকিলেও তিনি কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবহারে তিনি এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে তাঁহার অধীন প্রকৃতিকে একেবারে অসাড় ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে।

আমাদিগের দাসত্ব কি একপ্রকার? আমরা কি শুদ্ধ রাজনৈতিক দাসত্বের অধীন? সত্য বটে এ দাসত্ব উন্মোচনের এক্ষণে উপায় নাই; বরং ইহার বশীভূত হইয়া থাকা আপাততঃ কল্যাণকর। কিন্তু যে সমস্ত দাসত্ব উন্মোচন করিবার উপায় আছে, যে উপায় আমা-দিগেরই হস্তে সমর্পিত আছে, সে সমুদায় দাসত্ব উন্মোচন করিতে আমরা উদ্যত হই না কেন? কেন আমরা সামাজিক ও পারিবারিক দাসত্বের চিরকাল অধীন থাকি? এই অধীনতায় কি আমাদিগের কার্য্যশক্তি পরিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই? আমরা দেখিতেছি আমাদিগের অনেক প্রচলিত আচার ব্যবহার দূষিত, আত্ম-স্বাধীনতার অন্তরায়, প্রকৃত মঙ্গলের ঘোর প্রতিবন্ধক। সে সকল আচার ব্যবহারের দাসত্বে কেন আমরা চিরদিন বশীভূত হইয়া রহিয়াছি? তাহার কারণ এই, এই অধীনতায় থাকিয়া আমাদিগের প্রকৃতি এতদূর মৃদু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই অধীনতার প্রভাব অতিক্রম করা, আর আমাদিগের আয়ত্তির মধ্যে নাই।

আমরা সেই গোপনীয় প্রভাবে অজ্ঞাতসারে এরূপ বশীভূত হইয়া আছি যে, সে প্রভাব অনুভব করিবার ও বুঝিবার আমাদিগের শক্তি নাই। মনে করিতেছি, অন্য কারণে নিষ্ফল হইতেছি। মনে করিতেছি, হয় ত উপযুক্ত ধন নাই, মান নাই, ক্ষমতা নাই, বুদ্ধি নাই, সেই জন্য দাঁড়াইতে পারি না। কিন্তু যে অধীনতা-শৃঙ্খল আমাদিগের হস্ত পদ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই, সেই অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে না পারিলে যে আমাদিগের তিলার্দ্ধ উন্নতি সাধন হইবে না, তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। ইহা রাজনৈতিক অধীনতা নহে, ইহা পারিবারিক ও সমাজের আচার ব্যবহারের অধীনতা। ইহাদিগের প্রভাব অল্প লোকেই বুঝিতে পারে, কারণ ইহাদিগের প্রভাব অদৃশ্য-ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদিগের দূষিত আচার ব্যবহারের অন্যান্য অনিষ্ট অতি সামান্য, কিন্তু এই সমস্ত আচার ব্যবহার আমাদিগের প্রকৃতিকে যেরূপ নিস্তেজ, দুর্ব্বল ও জড়ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ততদূর অধীনতার প্রভাবই মহা অনিষ্টকর। আমরা জানিনা, আমরা সেই প্রভাবে কতদূর দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছি। এই অজ্ঞানতাই মহা অনিষ্টকর। আমরা এই প্রবন্ধে সেই প্রভাবের যথাযথ বর্ণন এবং সেই অজ্ঞানতার নিরসন করিতে চেষ্টা করিব।

যতদিন না বাঙ্গালীজাতি এই অধীনতা পরিত্যাগ করেন, এবং অল্পে অল্পে স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মনির্ভর হয়েন, আত্ম-মর্য্যাদা শিক্ষা করেন, এবং

আত্মম্ভরী হইয়া সকল কার্য্য আত্মহস্তে গ্রহণ করেন, ততদিন তাঁহার অভ্যুদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এই অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার প্রথম সোপান আত্ম-স্বাধীনতা, দ্বিতীয় সোপান পারিবারিক স্বাধীনতা এবং তৎপরেই সামাজিক স্বাধীনতা বিরাজিত রহিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির প্রত্যেকেই এই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর না হইলে তাঁহাদিগের সামাজিক স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নাই। একে একে স্বাধীন হইতে চেষ্টা না করিলে কখন স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীন হইতে চেষ্টা করাই স্বাধীন হইবার গরিষ্ঠ উপায়। স্বাধীন ভাব অবস্থার নাম, তাহা কার্য্য নহে; এবং সেই অবস্থায় চিরদিন থাকিতে হইলে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে অবস্থিত হইয়া আত্মনির্ভর শিক্ষা করা আবশ্যক। যিনি স্বাধীন অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা করেন, তিনিই চির-স্বাধীন হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়েন।

১। আত্ম-স্বাধীনতা। আপনি স্বাধীন না থাকিলে পরকে স্বাধীন করিতে যাওয়া বৃথা। আপনার মনে স্বাধীনতার ভাব এরূপ উজ্জ্বলিত থাকা চাই, যে অপরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেই সেই ভাবে যেন উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। আপনার কার্য্যে স্বাধীন চেষ্টা এবং আপনার কর্ত্তৃত্বে আত্মনির্ভরের ভাব শিক্ষা না দিতে পারিলে অপরকে এই স্বাধীনতার নূতন পথে অনুসারী করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, আমি যাহা মুখে বলি তাহা কর, যাহা কার্য্যে করি তাহা করিও

না, তিনি মানব প্রকৃতির কিছুই বুঝিতেন না; তিনি নিতান্ত অবজ্ঞেয় কথা কহিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য-সমাজ দৃষ্টান্তের যত অনুগামী, শুদ্ধ উপদেশের তত অনুগামী নহে। যে ভাব কেবল উপদেশেই নিঃশেষিত হয়, সে ভাবের কিছুই ফল নাই, কিন্তু যে তেজ কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে, তাহা মানবকুলকে কার্য্যক্ষেত্রে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। একা লিয়নিডাস গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার পথে প্রথম নায়ক স্বরূপ হইয়া শত সহস্র ব্যক্তির মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়া দেন। একা এলেকজাণ্ডারের তেজ প্রাচীন পৃথিবীতে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পিলপিডাস্ একাকী থিবের উদ্ধার সাধন করেন। টাইমোলিয়ান স্বাধীনতার অনুরাগে এতদূর পূর্ণ ছিলেন, যে তিনি একাকী শত শত স্বদেশীয়গণকে সেই ভাবে উত্তেজিত করিয়া পীড়িত সিসিলির দাসত্ব মোচন করেন *। গ্রাকাইদ্বয় যে রব রোমে ধ্বনিত করিয়াছিলেন, আজিও ম্যাট্সিনির রোমে সেই রব প্রতি বীরের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ওয়ালেস্ এবং ব্রুসের নাম শুনিবা মাত্র পঞ্জরসার বাঙ্গালীর শরীরও আজি লোমাঞ্চিত হয়। ইহাঁদিগের প্রতিজনের হৃদয় স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগে এরূপ উৎসাহিত ছিল, যে তাঁহারা প্রত্যেকেই শত সহস্র জনকে সেই ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শুদ্ধ ভাবে নয়, তাঁহারা প্রত্যেকেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া

* vide Plutarch's Life of Timolean.

সেই স্বাধীনতার তেজ চারিধারে বিকীর্ণ করিয়াছিলেন; এবং এক এক জন এক এক দেশকে সেই ভাবে উন্মত্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের প্রধান উপায় আত্ম-নির্ভর করা। যিনি আপনার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে না পারেন, তাঁহাকে পরের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবেই হইবে, এবং যে পরিমাণে পরের আনুগত্য স্বীকার করিবেন সেই পরিমাণে পরাধীন হইয়া থাকিবেন। পরাধীনতায় মানসিক শক্তি ও প্রবৃত্তি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে না; কার্য্যশক্তি স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি আত্ম-নির্ভর করিতে পারেন, তাঁহার কার্য্য করিতে সাহস হয়, কার্য্য করিতে সাহস হইলে ক্রমে সর্ব্বপ্রকার মানসিক শক্তিরও স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। আত্ম-নির্ভর করিতে পারিলে বিবেচনার উদ্রেক হয়, এবং বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি সাধন হয়। এই আত্ম-নির্ভর নাই বলিয়া বাঙ্গালী জাতির সাহস নাই, তাহাদিগের কতদূর শক্তি আছে তাহার জ্ঞান নাই। এই আত্ম-নির্ভর নাই বলিয়া বাঙ্গালী জাতি কোন স্বাধীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। পরাধীনতা ও পরের চাকরি স্বীকার করিয়া চিরদিন দুঃখে ও মনস্তাপে কালাতিপাত করেন। পরাধীনতায় ও পরের চাকরি করিয়া তাঁহাদিগের স্বাধীন শক্তি ও প্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া

যাইতেছে, এবং তাঁহাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতার সহিত মানসিক দুর্ব্বলতারও বৃদ্ধি হইতেছে।

কার্য্যতেই কার্য্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়। অল্পে অল্পে আত্মনির্ভর করিতে না পারিলে বৃহৎ কার্য্যে আত্মনির্ভর জন্মায় না। আত্মনির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে গেলে, সে কার্য্য-পথে অনেক বার পদস্খলন হইবে তাহা নিশ্চয়, কিন্তু সেই প্রকার পদস্খলন না হইলে দাঁড়াইবার শক্তি জন্মিবে না। চিরদিন পরের হাত ধরিয়া চলিলে কি চলিতে শিখা যায়? স্বতন্ত্র হইয়া চলিতে শিখ, অনায়াসে চলিতে পারিবে।

স্বাতন্ত্র্য আত্মনির্ভরের প্রধান অঙ্গ। বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য কোন বিষয়েই নাই। কি আত্মকার্য্যে, কি পরিবারমণ্ডলে, কি সমাজে, বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য কোন খানে নাই। তিনি আজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত পরের হাত ধরিয়া চলিয়া বেড়ান। জীবনের অল্প কালই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য হয়, সুতরাং তাঁহার আত্মনির্ভরের শক্তি জন্মায় না। এক্ষণে আমরা এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিষয়ে উপস্থিত হইতেছি,—তাহা পারিবারিক স্বাধীনতা।

২। আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্রতার পথে বিষম অন্তরায়। যে কোন কারণে এই পারিবারিক ব্যবস্থার উৎপত্তি হউক না, আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। এই পারিবারিক ব্যবস্থায় আমাদিগকে জীবনের অধিকাংশ সময়ই পরাধীন হইয়া থাকিতে হয়, পরাধীন থাকিয়া আমরা ক্রমশঃ নিস্তেজ

ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া যাই, তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই বিষয় প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। একান্নবর্ত্তী পরিবারমণ্ডলে যত সুখ, তাহা এক্ষণে সকলে জানিতে পারিতেছেন। ইহার অন্যান্য দোষের বিষয় আমরা উল্লেখ করিতে চাহি না। কিন্তু ইহাতে আমাদিগকে যে চিরকাল পরাধীন করিয়া রাখে, আমাদিগের স্বাধীন কার্য্যশক্তি বিনষ্ট করে, ক্রমশঃ আমাদিগকে পরাধীনতায় আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করিয়া আনে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলে, ইহাই আমরা উল্লেখ করিতে চাহি; ইহাই এই একান্নবর্ত্তী পারিবারিক ব্যবস্থার একটী প্রধান দোষ, এবং এই দোষে বাঙ্গালীজাতি সমুদায় কেমন দুর্ব্বল ও পরাধীনতায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহাদিগের অগ্রে দেখা আবশ্যক। যত দিন জনক জননী অথবা অপর কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে থাকা প্রয়োজনীয় ও বিধেয়, আমরা ততদিনের অধীনতা দোষই বলি না, কিন্তু যখন স্ব স্ব ভার গ্রহণে সকলে সমর্থ হয়েন, তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে পরের কর্ত্তৃত্বে ও সম্পূর্ণ অধীনতায় থাকিলে নিজের স্বাধীন বৃত্তি ও প্রকৃতি এরূপ দমিত হইয়া পড়ে যে, আপনার সমুদায় তেজস্বিতা হ্রাস হইয়া যায়, এবং সর্ব্ববিষয়ে পরের বশবর্ত্তিতায় আপনার স্বাধীন অস্তিত্ব-সমুদায় বিনষ্ট হইয়া পড়ে। এতদূর বিনষ্ট হইয়া পড়ে যে, সেই পরিবারমণ্ডলে আপনাকে জড়বৎ অবস্থান করিতে হয়। যিনি ত্রিশ অথবা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে অবস্থান করেন, তাঁহার জীবনে স্বাধীনতা ও

স্বকর্তৃত্বের আর কি থাকে? একান্নবর্ত্তী পরিবারমণ্ডলে অনেকেরই কি এই দশা ঘটে না?

অধিক বয়স পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী পরিবার-মণ্ডলে জনক জননী অথবা অপর কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে থাকিলে সেই অধীনতা অল্পে অল্পে শান্ত প্রভাবে, এবং অজ্ঞাতসারে মনের তেজস্বিতা হরণ করিতে থাকে। সেই অধীনতায় আমাদিগের প্রকৃতি নিতান্ত মৃদু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আইসে। ইহার সামাজিক ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা একটী বিষম নিশ্চেষ্ট জাতিরূপে পরিণত হইয়াছি। আমাদিগের প্রকৃতি জড়প্রায় হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধ ইচ্ছায় আমাদিগের কার্য্য হয় না। কার্য্যের জন্য যে প্রতিজ্ঞা, যে সাহস, যে উৎসাহ, ও যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা অণুমাত্র আমাদিগের শরীরে নাই। তেজস্বিতা কিরূপ বাঙ্গালী তাহা জানে না। কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্য করায় যে বল আবশ্যক করে, তাহা আমাদিগের নাই। এই বল বিহনে আমাদিগের ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কখন কার্য্যকারিতায় পরিণত হইতে পারে না। পারিবারিক শাসন ও প্রভুত্ব, সে কার্য্যকারিতা ক্রমশঃ হরণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর সাধ্য নাই, বাধা ও বিপত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়; সুতরাং সকল সামাজিক সদনুষ্ঠান ও সংস্কার, কল্পনা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কারণ, সকল সংস্কারেই বিস্তর বাধা ও বিপত্তি আছে। স্বাধীনভাবে আপনার প্রতিজ্ঞাবলে দণ্ডায়মান হওয়া বাঙ্গালীর কার্য্য নহে; কারণ, পারিবারিক একাধিপত্য, সে স্বাধীনতা

ও প্রতিজ্ঞাবল একে একে সম্পূর্ণ হরণ করিয়াছে। সুতরাং, যে সমাজ-সংস্কারে এই প্রতিজ্ঞাবলের আদৌ আবশ্যক তাহা বৃথায় হইয়া যায়। এই পারিবারিক একাধিপত্যের সামাজিক ফল কিরূপ অনিষ্টকর, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

একান্নবর্ত্তী পরিবারমণ্ডলের এইরূপ একাধিপত্যে যাহাদিগের অবস্থান করিতে হয় না, অন্যান্য কারণে তাহাদিগের তেজস্বিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। বাল্য-বিবাহ একটী প্রধান কারণ। বাল্য-বিবাহ নিবন্ধন অল্পবয়সেই আমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যায়, পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ি। নানাবিধ ভাবনা চিন্তা আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে। পরিবারের ভরণ-পোষণ, পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহ-দান, প্রভৃতি কিরূপে সম্পন্ন হইবে এই ভাবনায় আমরা নিয়ত অল্প-বয়সেই নিতান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া পড়ি। ইহাতে আমাদিগের নিজের স্বাধীনতা অতি অল্প বয়স হইতেই বিনষ্ট হইতে থাকে। সেই স্ত্রী পুত্র কন্যাই আমাদিগের সর্ব্বচিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করা নিতান্ত অসম্ভব ও অন্যায়। অল্পবয়সেই এই পারিবারিক অধীনতা-শৃঙ্খল আমরা আপনাপনিই ধারণ করি। অজ্ঞানাবস্থায়, পিতা মাতা আমাদিগকে এই শৃঙ্খল পরাইয়া দেন। পরাইয়া দিয়া চিরদিনের জন্য আমাদিগকে অধঃপাতে দেন।

এই পারিবারিক অধীনতার প্রভাব অতি শান্ত ও অজ্ঞাতভাবে আমাদিগকে শাসন করে। ইহার শাসন

আমাদিগের হৃদয়-রাজ্যে। স্নেহ, মমতা ইহার প্রধান শাসন-রজ্জু। আমাদিগের উপর পরিবারের সম্পূর্ণ নির্ভর ও অধীনতা থাকাতে আমরা অতি দৃঢ় বন্ধনে তাহাদিগের অধীনতায় বশীভূত হই। আত্মোন্নতিকে তাহাদিগের অধীনতায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। স্বাধীনতাকে অগ্রে বলি দিয়া তবে বাল্য-বিবাহ করি। প্রতিজ্ঞাবল তাহাদিগের ভাবনা চিন্তায় কোথায় উড়িয়া যায়। যে পরিবারের সুখের জন্য ব্যতিব্যস্ত হই, এবং আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিই, তাহাদিগের সেই সুখসাধনের উপায় সকলও স্বাধীনভাবে অবলম্বিত হইতে পারে না। যে সময়ে আপনাদিগকে কে ভরণ-পোষণ করে তাহার ঠিকানা নাই, সেই সময় হয় ত পাঁচজন পরিবার আমাদিগের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে। তুমি তাহাদিগের ভাবনা ভাবিবে, না—আত্মোন্নতির জন্য দেশ-দেশান্তরে ফিরিয়া বেড়াইবে। তোমার সাধ্য নাই, সেই পরিবার-গণকে ফেলিয়া তুমি এক পদও সঞ্চালন কর। যতদিন তোমার বিবাহ না হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর, বালিকা-বিবাহের উপর, বেস বক্তৃতা করিবে; কিন্তু যেই মাত্র তোমার বিবাহ হইল, অমনি তোমার কণ্ঠরব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে। তুমি অবশেষে সামাজিকতার ঘোর দাস হইয়া যাও। ইহার কারণ কি? তুমি সেই পরিবারের দুঃখ দেখিতে পারিবে না বলিয়া সমাজের সঙ্গে মিশিয়া, যতদূর সাধ্য, তাহাদিগের সুখের চেষ্টা করিয়া বেড়াও। পারিবারিক সুখ তোমার

হৃদয়কে হরণ করিয়া রাখে; পাছে কোনমতে তাহার বিঘ্ন ঘটে, এই জন্য তুমি আপাততঃ ক্লেশকর সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে পার না। কিন্তু পূর্ব্বে বাল্য-বিবাহ না হইলে অগ্রে আত্মোন্নতি সাধন করিয়া, সমাজে স্বাধীন ভাবে অগ্রে দাড়াইবার শক্তি ধরিয়া, পরে বিবাহ-জনিত পরিবার-মণ্ডলে বেষ্টিত হইলে, তাহাদিগের সুখের জন্য কিছু উৎসর্গ ও ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না। তখন স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া বিলক্ষণ পারিবারিক সুখ সাধন করা যাইতে পারে। এই পারিবারিক সুখের জন্য তুমি দেশাচারের বশবর্ত্তী হও। দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া যে দায়ে আপনি দিনরাত কাঁদিতেছ, সেই দায়ে আবার আপনারই পুত্রগণকে অনায়াসেই নিক্ষেপ কর। তাহা-দিগেরও বাল্য-বিবাহ দাও। তাহার কারণ এই, যত দিনে তাহারা বিবাহাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ততদিনে তোমার অন্তর হইতে সকল তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি জানিতে পার নাই, যে ধীরে ধীরে তুমি কেমন সমাজের দাস হইয়া পড়িয়াছ। কিন্তু বরাবর তুমি যদি তেজস্বিতা বজায় রাখিতে পারিতে, বরাবর যদি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিতে, এরূপ কখনই ঘটিত না। তাহা ত হয় নাই, সুতরাং অভ্যাসের প্রভাব তোমাতে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি সকল কার্য্য অভ্যাস বশতঃ যেমন দ্বিরুক্তি না করিয়া অনায়াসে সাধন করিয়া আসিয়াছ, এই ঘোর অন্যায় কার্য্যে ও যে তদ্রূপ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ। পুত্র কন্যার বাল্য-বিবাহ দিয়া তুমি তাহাদিগকেও অধঃপাতে দিলে। তোমার ন্যায় শিক্ষিত জনেকের হস্তে পড়িয়াও তাহাদিগের কি দুর্দ্দশা ঘটিল? জানিয়া শুনিয়াও তুমি যে অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার পাতক তোমার। না জানিয়া শুনিয়া তোমার জনক জননী যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তুমি জানিয়া শুনিয়াও সেই অনিষ্ট করিলে। তবে তোমার জানাতে এবং না জানাতে কি ফল ঘটিল। বরং না জানিয়া এরূপ করিলে তোমার ততদূর দোষ ছিল না। কিন্তু কি করিবে? তুমি কি এখন আর তোমার আছ? তোমার যে কিছু সারবত্তা ছিল, তাহা সমুদায় বিসর্জ্জিত হইয়াছে। তুমি এখন পরিবারের দাস, দেশাচারের দাস, সমাজের দাস। তুমি এই দাসানুদাস হইয়া অতি নীচ ও অবজ্ঞেয় হইয়াছ।

আর এক কারণে আমাদিগের পারিবারিক অধীনতার বৃদ্ধি হইয়াছে। এদেশে স্ত্রীজাতির যেমন অধীনতা, অন্য দেশে ততদূর নহে। আমরা স্ত্রীজাতির উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করিয়াছি, কিন্তু এতন্নিবন্ধন যে সমস্ত সামাজিক অনিষ্টপাত হইয়াছে, তাহাতে সেই পাতকের বিলক্ষণ প্রতিশোধ হইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখিয়াছি, তাহারাও আমাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা বিলক্ষণ হরণ করিয়াছে। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা যাহা, তাহার

ব্যতিক্রম ঘটিলে, অনিষ্ট কেবল এক পক্ষে ঘটে না। আমরা স্ত্রীজাতির যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছি, সেই অনিষ্ট ঘুরিয়া আমাদিগের উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের প্রভুত্ব—জোর; তাহাদিগের গোপনীয় শাসন জোর নহে, কিন্তু জোর অপেক্ষা আর কিছু অধিক। স্বেচ্ছামত আমরা স্ত্রীজাতিকে পবিত্র রাখিতে চাই। অধীন স্ত্রীজাতি তাহাই রহিল। বিধবার বিবাহ নাই। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইল, যত বিধবা, পুরুষের গলগ্রহ ও মহা ভাবনার বিষয় হইল। প্রায় এমত গৃহ নাই, যেখানে এই ভাবনার বিষয় নাই। বঙ্গ সমাজে সধবা যত, বিধবার সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। এই বিধবাগণ সমাজের মহা ভাবনার বিষয়। পুত্র কলত্র অপেক্ষাও তাহাদিগের জন্য অধিক ভাবিত থাকিতে হয়। তাহাদিগকে ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবার যো নাই। তোমার পুত্রকলত্রকে দেখিবার বরং অন্য লোক আছে, কিন্তু তোমার বিধবা ভগ্নী, কি ভাগিনেয়ী, কি পিসী, মাসী, কি জননীকে তুমি ভিন্ন দেখিবার আর কেহই নাই। ইহারা তোমার সম্পূর্ণ অধীন। কারণ, তুমি ভিন্ন এজগতে তাহাদিগের আর কেহই নাই। তাহারা তোমার উপর নির্ভর করিয়া দিবা নিশি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। তোমার সান্ত্বনা বাক্য শুনিলে তাহাদিগের হৃদয়-ব্যথা বরং কথঞ্চিৎ অপনীত হয়। তোমার মুখচন্দ্র না দেখিলে তাহারা নিদারুণ কষ্ট পায়। তোমার উপর তাহারা এতদূর নির্ভর করে যে, নিজ উন্নতির জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া

তোমার কি সাধ্য? তুমি একদিন বাহিরে গিয়াছ, তোমার হৃদয় তাহাদিগের জন্য চঞ্চল হইতেছে। অতি সূক্ষ্ম সূত্রে তাহারা তোমাকে শৃঙ্খল অপেক্ষাও দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করিয়াছে। তোমার আশ্রিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। তোমার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই হয় ত তাহারা তোমার আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা তোমার পুত্র কলত্র অপেক্ষা অধিক; তাহারাই তোমার প্রকৃত পরিবার।

ইহাদিগের দুঃখমোচনের নিমিত্ত হয় ত অতি বাল্যকাল হইতে উপার্জ্জনের জন্য তোমাকে লালায়িত হইতে হয়। আত্মোন্নতির সকল পন্থা বিসর্জ্জন দিয়া ইহাদিগেরই সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে হয়। ইহারা তোমাকে স্নেহ ও মমতা সূত্রে এরূপ অধীন করিয়া রাখে, যে তুমি তাহাদিগের অনভিমতে কোন কার্য্যের কথা মাত্র উত্থাপিত করিতে পার না। যতদিন তাহারা জীবিত থাকে, ততদিন তাহাদিগের মনোবেদনা দিয়া কোন কার্য্য করিতে সাহসী হও না। আত্ম-উন্নতি, কি সমাজ-সংস্কার, তাহারা মরিলে পার। কিন্তু ইতিমধ্যে কত প্রস্তাব তোমার মনে উদিত হয়; কত ইচ্ছা তোমার হৃদয়কে উত্তেজিত করে; সাধ্য কি তুমি তাহার তিলার্দ্ধ সম্পন্ন কর। সে সমস্ত অন্তরে উদ্ভূত হইয়া, অন্তরেই বিলীন হইয়া আইসে। কিছুকাল পরে, তোমার সকল তেজ বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে তোমার

প্রকৃতি ক্রমশঃ এরূপ জড়প্রায় হইয়া পড়ে যে, সময়-কালে তোমার সমুদায় কার্য্যশক্তি আর উদ্রিক্ত হয় না।

পারিবারিক প্রভাব ও অধীনতা অতি সূক্ষ্ম বিষয়। ইহা অতিক্রম করা অতি কঠিন কার্য্য। অতি গোপন-ভাবে ইহা কার্য্য করে, এবং হৃদয়কে পরাভূত ও নিস্তেজ করিয়া আনে; ধীরে ধীরে অতি দীর্ঘকালে আমাদিগকে সম্পূর্ণ বল-বীর্য্য-হীন করিয়া আনে। অবশেষে তাহারই দাসত্বে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলে। আমরা এই অধীনতায় এত নিস্তেজ হইয়া পড়ি যে, আমাদিগের কিছুই কার্য্যশক্তি থাকে না। সমাজের কোন অনুষ্ঠানে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। এই প্রভাব অতি-ক্রম করিতে না পারিলে আমাদিগের কার্য্যশক্তির বৃদ্ধি হইবে না। সামাজিক দেশাচারে আমাদিগের প্রকৃতিকে নিতান্ত মৃদু করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত দূষিত দেশাচারকে বিপর্য্যস্ত করিতে না পারিলে আমাদিগের মঙ্গল নাই। ইহাদিগের বশীভূত থাকিয়া স্বাধীনতা লাভে আমরা কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। এই দেশাচারই আমাদিগের অধীনতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি করি-তেছে। এবং অধীনতা বাড়িতেছে বলিয়া তাহাদিগের শাসন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। দেশাচার অধীনতার প্রতিপোষক, এবং অধীনতা দেশাচারের প্রতিপোষক। ইহারা পরস্পরের সাহায্যে উভয়েই পরি-পুষ্ট হইতেছে। আমাদিগের সমাজের এইরূপ বিকৃত গঠন; এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। এসমাজকে সম্পূর্ণরূপ

বিলোড়িত না করিলে আর নিস্তার নাই। ইহার আমূল দূষিত। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে তবে আমরা একদিন স্বাধীনতার আশা-পথে অবস্থিত হইব। নহিলে সমুদায় পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমরা এই পারিবারিক অধীনতার নিতান্ত বিরোধী। বিরোধী এই জন্য, যে ইহার কুফল একটী সমগ্র জাতির তেজস্বিতা একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে। এই কুফল এমন ধীরে ধীরে ফলে, প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে এমন নীচ ও বিনম্র করিয়া ফেলে, যে কেহই প্রায় ইহা ধরিতে পারে না। আমরা যদি জাতীয় উন্নতি খুঁজি, যদি স্বাধীনতার সুখপ্রার্থী হই, তাহা হইলে সেই উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে যতগুলি কণ্টক আছে, তাহাদিগকে একে একে ছেদন করা আবশ্যক। ইহাদিগের কেহই সামান্য নহে। নানা কারণে আমাদিগের জাতীয় অবনতি হইয়াছে। এক্ষণে একে একে সেই সমস্ত কারণ নিরাকরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; এবং ক্রমশঃ যেমন এক একটীর নিরাকরণ হইবে, অমনি সেই শত্রু-হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করাও বিধেয়। নহিলে এক দিনে ও একেবারে কেহ উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিতে পারে না। জাতীয় উন্নতির গতি অতি ধীরে ধীরে হয়; এবং নানা উপায়ে তাহা সংসাধিত করিতে হয়। যিনি আত্ম-স্বাধীনতা চাহেন, তাঁহার পারিবারিক স্বাধীনতা সংসাধন করা নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে আমরা এই প্রস্তাবের তৃতীয় অংশে আসিয়া পড়িলাম।

৩। বঙ্গদেশে কেন, ভারতবর্ষে কখন সামাজিক স্বাধীনতা ছিল না। ভারতবর্ষ চিরকাল সামাজিক অধীনতা ও দাসত্বে নিপীড়িত হইয়া উৎসন্ন গিয়াছে। ভারতবর্ষ চিরকাল কুচক্রী ব্রাহ্মণদিগের শাসনে দাসত্বের নিগড়ে নিবদ্ধ আছে। আর্য্যেরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন এই ব্রাহ্মণেরা রাজশাসন-ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রবল প্রতাপের সহিত প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের একাধিপত্য ও উৎপীড়ন দোষে ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী হইলেন। নববল ও নব তেজে উন্মত্ত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দিলেন। পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে সেই একাধিপত্য ও উৎপীড়নের কি প্রতিবিধান হইল? ব্রাহ্মণ জাতির পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়কুল সমপ্রভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতে লাগিলেন। রাজবংশ ব্যতীত অপর সকলেই সামাজিক দাসত্বে সমভাবে নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। পরশুরাম ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কতিপয় জনপদ মাত্র নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরশুরাম জ্ঞান করিলেন সমগ্র ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে। অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ পুনরায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ক্ষত্রিয়কুলে পরিপূর্ণ হইল। ক্ষত্রিয়গণ নির্ব্বিবাদে রাজত্ব ও প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু চতুর ব্রাহ্মণগণ পরাভূত হইবার নহে। তাঁহারা সিংহাসন বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহারা অন্য দিকে অন্য উপায়ে ভারতবর্ষ শাসনের পন্থা দেখিতে লাগিলেন। রাজ্য-

শাসনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের একাধিপত্য স্থাপিত করিলেন। এই কৌশলে ব্রাহ্মণেরা আবার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের আদেশেই রাজ-বিধান, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাবৃত্ত এবং সকলই হইল। সামাজিক আচার ব্যবহার ও নিয়মাদি তাঁহাদিগের আদেশেই পরিবর্ত্তিত, নিয়মিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা একদিকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন অন্যদিকে তাহার পূরণ করিয়া লইলেন। কি রাজকুল, কি প্রাকৃত জনগণ, সর্ব্ব সাধারণেই ব্রাহ্মণদিগের শাসনে শাসিত হইতে লাগিল। তাঁহারা সমাজে ঘোর আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষে দ্বিবিধ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। ক্ষত্রিয়বর্গের রাজনৈতিক প্রভুত্ব এবং ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রীয় প্রভুত্ব। জনসাধারণ ঘোর সামাজিক দাসত্বে আবদ্ধ হইল। এই দাসত্ব আজি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আজি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-কৌশল-প্রবর্ত্তিত জাতিভেদ ও সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধান ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মরূপে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং জনসমাজকে প্রবলরূপে শাসন করিতেছে। ভারতে কত শত রাজকীয় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তবুও ব্রাহ্মণদিগের এই সামাজিক শাসনের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ব্রাহ্মণ জাতির এই প্রকার অবৈধ ক্ষমতা ও শাসনে সমাজের অন্যান্য জাতি সমুদায় তাঁহাদিগের অধীনতা ও দাসত্বে নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়-কুল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের এই শাসনে ক্রমশঃ অনুশাসিত

হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, ভারতে ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে ক্ষত্রিয় জাতি দেশের বল ও দুর্গ স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপে পরাভূত হইয়া সমুদায় মানসিক তেজ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, যখন ব্রাহ্মণদিগের অধীনতায় তাঁহারা ক্রমশঃ ভীরু-স্বভাব ও মানসিক-তেজবিরহিত হইয়া পড়িলেন, তখন ভারতবর্ষ যে নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় ও ধর্ম্মীয় প্রভুত্বে এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অন্যবিধ প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষী হয়েন নাই। তাঁহারা বহুকাল ধরিয়া যেরূপ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে আর অস্ত্র-ধারণে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় নাই। কেবল শাস্ত্রালোচনায় এবং বৈরাগ্য ধর্ম্মে তাঁহাদিগের প্রকৃতি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল যে, সেই প্রকৃতি ও জ্ঞান-প্রভাবে তাঁহারা অস্ত্র-ধারণে অক্ষম হইয়া ছিলেন। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষ যে অরক্ষণীয় হইয়া থাকিবে তাহার আর সন্দেহ কি? ভারতবর্ষ সুতরাং শত্রু-হস্তে নিপতিত হইল।

ভারতের অবস্থা প্রাচীন মিশরেও ঘটিয়াছে। ভারতে যেমন ব্রাহ্মণজাতির একাধিপত্য, মিশরেও তেমনি পুরোহিত জাতির ঘোর প্রভুত্ব ছিল। প্রাচীন মিশর কোথায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রোমের ধ্বংসের কারণও সম্রাটীয় শাসনের অযথা বিক্রম। রোমীয় সাম্রাজ্যের

ঘোর একাধিপত্যে প্রজাগণ ক্রমশঃ নির্ব্বীর্য্য ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বকালের প্রভূত পরাক্রমশালী রোমীয়-গণের অধোগতি ঘটিয়া আসিল। প্রজাগণ ক্রমশঃ সমস্ত রাজকীয় ব্যাপারে উদাসীন হইল। রাজ্যের সমস্ত ভার ও পীড়ন, মধ্যম-শ্রেণী কিউরেলদের উপর নিপতিত হইল। কর-ভারাক্রান্ত নিপীড়িত কিউরেলগণের অধোগতিতে রোমরাজ্য বীর্য্যহীন হইয়া গেল। এই রোগে রোমরাজ্য যখন মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তখন বর্ব্বরজাতি আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল। সুতরাং রোমরাজ্যও ভারতের মত অনায়াসে শত্রু-হস্তে পতিত হইল। *

ভারতের ন্যায় প্রাচীন জুডিয়ায়ও পুরোহিতগণের ঘোর প্রভুত্ব ছিল। কিন্তু জুডিয়ার অবস্থা ঠিক ভারতের মত ছিল না। যতদিন জুডিয়া রাজ্যে এই অবস্থাগত বিভিন্নতা ছিল, ততদিন জুডিয়ার ধ্বংস হয় নাই। জুডিয়াতেও দ্বিবিধ প্রভুত্ব বিস্তারিত ছিল। ভারতে যেমন একদা ক্ষত্রিয়গণের রাজকীয় ক্ষমতা ও ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মীয় শাসনের ঘোর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, জুডিয়াও তদ্রূপ রাজকীয় প্রভুত্ব এবং পুরোহিতগণের প্রভুত্বে একদা জুড়িয়া রাজ্যের শাসন-দণ্ড দোদ্দুল্যমান হইয়াছে। কিন্তু জুডিয়ায় কোন প্রভুত্বই নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠে নাই। কোন প্রভুত্বই একদা সমগ্র জাতিকে অনুশাসিত করিয়া আনে নাই। সেখানে রাজকীয় ক্ষমতা যেমন প্রবল

* Vide Mill's Review of M. Guizot's work in his Dissertations and Discussions.

হইতে গিয়াছে, তদ্বিপরীতে ধর্ম্মীয় প্রভুত্ব সমপ্রবল হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে রাজসিংহাসনের উজ্জ্বলতা, অন্য-দিকে প্রফেট্ বা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের শাসন-গৌরব। ইহুদীগণের ধর্ম্মীয় বিশ্বাস তাহাদিগকে কিছুকাল সম্পূর্ণ পতন হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা মানিত যে, ঈশ্বরানুগ্রহ ও প্রত্যাদেশ তাহাদিগের প্রতি কখন নিঃশেষিত হইবে না। চতুর পণ্ডিতগণ এই বিশ্বাসকে তাহাদিগের শাসনাস্ত্র করিয়াছিল। এক এক জন এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের অনুগৃহীত বলিয়া প্রফেট্ নাম গ্রহণ করিত। প্রফেট্গণ রাজ্যের অন্যতর বল ছিল। তাহারা প্রায় রাজকীয় ক্ষমতা শাসনের জন্য নানা দৈববাণী প্রচার করিত। স্যাল্ভেডার (Salvador) বলেন, আধুনিক ইয়োরোপীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কায এই প্রফেট্গণ কর্ত্তৃক সাধিত হইত। প্রফেট্গণ ধর্ম্মের ও প্রত্যাদেশের যে পবিত্র আসনে বসিয়া আপনা-দিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন, রাজকীয় সিংহাসনের ক্ষমতা তথায় হতবল হইত। তাঁহারা সেই পবিত্র আসনে বসিয়া ধর্ম্মের নব নব বিধান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উন্নত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন; এবং সেই সমস্ত বিধান ও ব্যাখ্যা তৎপরে ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া যাইত। যতদিন জুড়িয়া রাজ্যের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, ততদিন তাহা সুরক্ষিত হইয়াছে *। কিন্তু যখন এই শাসন-তুলাদণ্ডের

* "Vide Mill's Representative Government." pp 41-42

এক দিক অধিকতর ভারাবনত হইল, তখন হইতে জুড়িয়া রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল।

আমরা মিলের সহিত স্বীকার করি যে, মানবজাতি যখন অসভ্য অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তখন তাহাদিগকে শাসনাধীনে আনিয়া বশীভূত রাখা কর্ত্তব্য। শৈশবে যেমন জনক জননীর অধীনতায় থাকা কর্ত্তব্য, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যতদিন এই বশ্যতা ও অধীনতা নিতান্ত দাসত্বে পরিণত না হয়, ততদিন জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু রাজকীয় অধীনতা যখন ঘোর দাসত্বে পরিণত হয়, তখন হইতে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। রাজ্য-তন্ত্র এরূপ হওয়া চাই, যেন বর্ত্তমান শাসন ও ব্যবস্থাবলি ভবিষ্য উন্নতির পথ রুদ্ধ না করে। যে স্থলে এইরূপ ভবিষ্য উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, সেস্থলে ক্রমশঃ ঘোর রাজকীয় অধীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। এই মর্ম্মভেদী ঘটনা ইতিহাসের অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মিশরের পুরোহিতের প্রভুত্ব, (Hierarchy) চীনরাজ্যের জনকাধিকার (Paternal despotism) আদৌ সেই রাজ্যদ্বয়কে অনেকদূর সভ্যতামার্গে উন্নীত করিয়াছিল। এই উপায়ে প্রথমে তাহাদিগের অনেকদূর উন্নতি-সাধন ও রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই উপায়ে সেই রাজ্যদ্বয় যে উন্নতি-সীমায় উত্থিত হইয়াছিল, এবং যে সীমা অতিক্রম করা সেই উপায়ের অসাধ্য ছিল, যে সীমা অতিক্রম করিলে সেই দুই প্রভুত্বের বিনাশ হইত, সমস্ত

রাজকীয় ব্যবস্থার গণ্ডগোল ও মহা বিশৃঙ্খলা ঘটিত, সেই সীমায় উন্নত হইয়া একদা চিরদিনের জন্য সেই রাজ্যদ্বয় দণ্ডায়মান ছিল। এই উন্নতি-সীমায় আসিয়া তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই সীমায় উপনীত হইয়া সেই দুই প্রভুত্বের বল-বিক্রম প্রভূত হইয়া উঠিল। এই প্রভুত্বের অধীনতায় সেই সেই রাজ্যের জাতীয় মানসিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। তাহাদিগের অধীনতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল *। যতদিন এই মানসিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব রক্ষিত ছিল, ততদিন তাহাদিগের উন্নতি-সাধন হইয়াছে। লোকে যতদিন স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করিতে পারিয়াছে, ততদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সভ্যতার গতি যে দিকে হউক না কেন, স্বাধীন কার্য্য-ক্ষেত্র পাইলে সেই দিকে উন্নতিসাধন হইবে। তবে, সভ্যতা যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, সেই পথানুসারে, এবং তাহার প্রকৃতি যেরূপ, সেই প্রকৃতি অনুসারে তাহার উন্নতি-সীমা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি এবং পথানুসারে এক এক জাতির সভ্যতা উন্নত ও সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উন্নতির পথ একবার অবরুদ্ধ হইয়া গেলে সেই পথে যদি না কার্য্য করা যায়, মহাজনগণ সদনুষ্ঠানে সেই উন্নতিকে যদি না জীবিত রাখেন, তবে সভ্যতা ক্রমশঃই অবনত হইতে থাকে ও জাতীয় পতন সংসাধিত হয়। যে যে রাজ্যে ক্রমশঃ জাতীয় ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে, লোকের পাপ, ঔদাসীন্য, আলস্য ও

* Mill's Representative Government. p 41

বিলাসিতার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার ক্রমশঃ অধোগতি ও পতন হইয়াছে। সাধারণ লোকের গতি কেবল আলস্য ও পাপের দিকেই পরিদৃষ্ট হয়। এই গতিকে অতিক্রম করিয়া সামাজিক স্রোতকে ফিরাইয়া না দিতে পারিলে উন্নতির পথ মুক্ত হয় না। এই স্রোতের প্রতিকূলে না দাঁড়াইতে পারিলে দেশের উন্নতি-সাধন হয় না। জনসাধারণের দুষ্ক্রিয়া; পাপ, আলস্য, অথবা মত্ততার দমন করিতে না পারিলে, কখন দেশীয় সভ্যতা ও উন্নতি সুরক্ষিত হয় না। এক এক সময়ে দেশের এক এক জন উন্নতচেতা সাধুব্যক্তি উঠিয়া স্বকীয় কার্য্য, উদ্যোগ ও সদনুষ্ঠানে স্বদেশকে পূর্ণ করেন বলিয়া তাহার অধোগতি নিবারিত হয়। যে দেশে এই প্রতিভা-সম্পন্ন মহাজনগণের অভাব, সেখানে অধোগতি অনিবার্য্য। সে দেশের ক্রমশঃই অধোগতি হইতে থাকে। অবশেষে এই অধঃপতন এতদূর সম্পন্ন হয় যে, সমগ্র জাতি একেবারে ঘোর বর্ব্বরতায় আসিয়া অবস্থিত হয়। তখন কিছুতেই সে অধঃপতন হইতে নিস্তার নাই। তাহা হইতে মুক্ত হওয়া এক প্রকার মানব-সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। ভারতের এখন এই অবস্থা।

সমাজে এক জাতির অবৈধ প্রভুতা থাকিলে এই রূপই ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন সমস্ত রাজ্যে সমাজে এক জাতির এই প্রকার অবৈধ প্রভুত্ব ছিল, সুতরাং সমস্ত প্রাচীন রাজ্য অধঃপতিত হইয়াছে। মিশরে ভারতের ন্যায় পুরোহিত জাতির অবৈধ ক্ষমতা, প্রাচীন পারস্য রাজ্যের

সৈনিক একাধিপত্য, ফিনিসিয়ার ধন-সম্পত্তির প্রভুতা; গ্রীশ, রোম, ও জুডিয়ার এক এক জাতির অযথা বিক্রম,—এই সমুদায় প্রাচীন রাজ্যের বিনাশের কারণ হইয়াছিল। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সমস্ত রাজ্যে সামাজিক অসাম্য বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। সামাজিক সকল জাতির সমান স্বত্ব ও অধিকার স্বীকৃত হইত না। এক জাতি অত্যন্ত প্রবল, এবং অপরাপর জাতি তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধীন, সমস্ত প্রাচীন সমাজের এই নিয়ম। সর্ব্ব জাতির সমান স্বত্ব ও অধিকার—এরূপ মত কখনই গ্রাহ্য হইত না। ভারতবর্ষ, মিশর ও জুড়িয়ায় জাতীয় উচ্চ নীচতা বিধাতার বিধান বলিয়া গণনীয় হইত, সুতরাং সে প্রভেদ অলঙ্ঘনীয়। অপরাপর প্রাচীন রাজ্যে এই প্রভেদ রাজ-শাসনে, রাজনৈতিক বিধানে প্রচলিত হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, এই সামাজিক অসাম্য থাকাতে যে প্রাচীন রাজ্য সমুদায় বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন সমাজে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাব অন্যবিধ ছিল তা বলিয়া নয়, প্রাচীন সমাজে যে জ্ঞানালোকের এবং বীরত্বের অভাব ছিল তা বলিয়া নয়, প্রাচীন রাজ্যে যে সমৃদ্ধির অভাব ছিল তা বলিয়া নয়, কিন্তু এই সামাজিক অসাম্য প্রভূত পরিমাণে ছিল বলিয়া প্রাচীন রাজ্য সমুদায় একে একে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।*

---

* আমি প্রথমে ১২৮৪ সালের আর্য্যদর্শনে "একে একে" নাম দিয়া এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করি। আমার

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব একবার কেবল এই জাতীয় উচ্চ নীচতা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানব-জাতির সকলেই সমান—এই মত বুদ্ধদেব পৃথিবীতে

প্রিয় সুহৃদ্ বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১২৮৭ সালের আর্য্যদর্শনে "অতীত ও বর্ত্তমান ভারত" নামক যে একটী বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকটিত করেন তাহাতে তিনি এই ভারতীয় অসাম্য-ভাব আরও বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধে এই অসাম্য-ভাবের সমুদায় অঙ্গ অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি আমার নমস্কার-ভাজন। আমাদিগের এই মতের বিপক্ষে কেহ কেহ বর্ত্তমান সমুদায় প্রাচ্য রাজ্যের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, সে সমুদায় রাজ্যে ত একজাতীয় প্রভুতা বিলক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ তাহাদিগের ত ধ্বংস হয় নাই। এতদুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, সেই সমস্ত রাজ্য যে আজিও দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কারণ, সেই সমস্ত রাজ্য অন্য বলে রক্ষিত হইতেছে। সামাজিক অসাম্য অনেকাংশে জাতীয় দুর্ব্বলতা সাধন করিয়া থাকে, এই কথা বলাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। প্রাচ্য রাজ্য সমুদায়ে যে এরূপ দুর্ব্বলতা আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা বলি, যে এই দুর্ব্বলতা থাকাতেও অন্য বলে রক্ষিত হইতেছে বলিয়া তাহারা লয় প্রাপ্ত হয় নাই। ইয়োরোপীয় রুশ হইতে প্রাচ্য চীন দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যের এই অবস্থা। তথায় এক দিকে সামাজিক অসাম্য হেতু জাতীয় দুর্ব্বলতা আছে, অন্যদিকে রাজকীয় বল প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্বাভাবিক স্বদেশানুরাগেরও তথায় অভাব নাই। সেখানে স্বজাতি-প্রেম ও জাতীয়-ভাবও অনেকাংশে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতিরাজ্যে জাতি সমুদায় এক

প্রচার করেন। বিধাতার নিকট সকল মনুষ্যই সমান, সকলই তাঁহার সন্তান সন্ততি, এ সংস্কার পূর্ব্বে কাহারও মনে উদয় হয় নাই। বুদ্ধদেব এই মত প্রচার করিয়া জাতিভেদ বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব এক বৈরাগ্য ও যোগ শিক্ষা দিয়া সকল শুভ উপদেশের মূলে কঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী ও যোগীগণ পৃথিবীর কোন কার্য্যে আইসে নাই।

ধর্ম্মাবলম্বী, এক ভাষাবলম্বী, ও এক পরিচ্ছদাবলম্বী, সুতরাং সমস্ত জাতি মধ্যে এক জাতীয়-ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজকীয়-বল, স্বদেশানুরাগ, ও স্বজাতি-প্রেম—এই ত্রিবিধ বল থাকাতে তাহাদিগের সামাজিক অসাম্য হেতু দুর্ব্বলতায় রাজ্যের কোন হানি হইতেছে না। যে যে রাজ্যে এই বল-সকলের যত হানি হইতে থাকে, সেই সেই রাজ্য ততই পতনোন্মুখ হইতে থাকে। ভারতে নানাবিধ অসাম্য হেতু সামাজিক ও জাতীয় দুর্ব্বলতা বিলক্ষণ সাধিত হইয়াছিল, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম ক্রমশঃই তিরোহিত হইয়াছিল, এবং যখন রাজকীয় বল একাকী দাঁড়াইতে অসমর্থ হইল তখন ভারত সুতরাং পতিত হইল। সামাজিক অসাম্য কতদূর জাতীয় বল বিনষ্ট করে, তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। এই অসাম্য যে পরিমাণে কমিবে সেই পরিমাণে জাতীয় বল প্রবর্দ্ধিত হইবে। সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাবে যাহা প্রাসঙ্গিক হইয়াছে আমি তন্মাত্র প্রদর্শন করিয়াছি। ভারত-পতনের সমুদায় কারণ সুতরাং এস্থলে নির্ণীত হয় নাই। তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ভারতের জাতীয় ধ্বংস ও দুর্ব্বলতার একটী প্রধান কারণ।

সে যাহা হউক, বৌদ্ধেরা যখন জাতিভেদ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই বিরোধের পরিণাম কি, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আজি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত থাকিলে, ভারতের ভাগ্য কিরূপ হইত তাহা অনুমান করা যায় না।

বুদ্ধের পর নানক ও চৈতন্যদেব ভারতে জাতিভেদ বিনষ্ট করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ঘোর প্রবলতা বশতঃ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সুপ্রচারিত হইল না। ইতিহাস প্রতিপন্ন করে যে, যে আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম-নিয়মাবলী যত অধিক লোক মধ্যে প্রচলিত থাকে তাহার আয়ু ও বল ততোধিক *। হিন্দুধর্ম্ম ভারতের একসীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সুপ্রচলিত থাকাতে তাহা এমনি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, তাহার প্রভাব ও বল অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। এজন্য কি বৌদ্ধধর্ম্ম, কি শিখ-ধর্ম্ম, কি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, কোন ধর্ম্মই ভারতে দাঁড়াইবার স্থল পাইল না। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। শিখ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে ছায়ামাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা অতি নিকৃষ্ট ভাবে জনকত লোক মধ্যে নিবদ্ধ

---

* "And it is a known social law, that the larger the space over which a particular set of institutions is diffused, the greater is its tenacity and vitality."——Sir. H. Maine's Ancient Law.

আছে। ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের মৌলিক পবিত্র ভাব তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণকার শিখ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অনেকাংশে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহারা হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত এরূপ মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগের আর স্বতন্ত্র জীবন উপলব্ধি হয় না। হিন্দুধর্ম্মের যে জাতি-ভেদ, সেই জাতিভেদ সমান প্রবল রহিয়াছে। শিখ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভ্রাতৃভাব কিছুই বর্ত্তমান নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সুপ্রচলিত হইলেও তাহার ভ্রাতৃভাব সমাজ-মধ্যে তত প্রবল হইত কি না, সন্দেহ; কারণ, তাহার মূল শিক্ষা ও উপদেশ সমস্ত সমাজের এত অনিষ্টকর যে তদ্দ্বারা কোন সামাজিক শুভফল প্রত্যাশা করা বৃথায়। *

বুদ্ধের পর খৃষ্ট এই মত অন্য জগতে প্রচার করেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভ্রাতৃভাব তাহার অমূল্য উপদেশ। এই ভাব প্রচার দ্বারা ইয়োরোপীয় জনসমাজ এক নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাব প্রচার দ্বারা ইয়োরোপের জনসমাজের সামাজিক স্বাধীনতা এখন দাঁড়াইবার স্থল পাইয়াছে। আর্কমিডিস্ তাঁহার দণ্ড স্থাপনের ভূমি পাইলেন।

---

* বৌদ্ধ, শিখ এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পতনের কারণ সমুদায় আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবু তাহার "অতীত ও বর্ত্তমান ভারত" নামক প্রস্তাবে বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যোগেন্দ্র বাবুর "হৃদয়োচ্ছ্বাস" নামক গ্রন্থ দেখুন।

খৃষ্টের এই মত ইয়োরোপীয় সমাজে অল্পে অল্প কেমন বদ্ধমূল হয়, তাহা খৃষ্টানধর্ম্মের ইতিবৃত্তে প্রকাশিত আছে। রোমে যখন এই মত প্রচারিত হইল, ইহার উদারতায় মোহিত হইয়া রোম তখন কৃষককেও পোপের ধর্ম্ম-সিংহাসনে উন্নীত করিতে লজ্জিত হয়েন নাই। জন্ হস্ এই অমৃতময় উপদেশ প্রচার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরোহিতের সহিত সামান্য লোকের প্রভেদ কি? লুথার সকলের স্বাধীন মত প্রচারের জন্য ইয়োরোপে কি অগ্নিকাণ্ডই না প্রজ্বালিত করিয়াছিলনে। ভল্‌টেয়ার এবং বিশ্বাভিধানিকেরা (The Encyclopedists) সেই রব প্রতিধ্বনিত করিলেন। সেই রব আজিও উদ্ঘোষিত হইতেছে। আজি নির্ধন ও ধনী, সকলেই রাজার সহিত সমস্বত্বাধিকারী হইতে সচেষ্ট হইতেছেন। ইহুদীরা সে দিন মাত্র রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হইলেন। তজ্জন্য ডিস্‌রেলী মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আজিও ইয়োরোপীয় সমাজে এই মতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিসমাপ্ত হয় নাই। সেই দ্বন্দ্ব আজিও বিলক্ষণ প্রবল। এ বিষয়ে আমেরিকা অনেকদূর অগ্রসর বলিতে হইবেক *।

---

* ইদানীন্তন আমেরিকার অবস্থা তদ্দেশীয় কোন ভ্রমণকারীর বিবরণে পাঠ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া ব্রিটিশ শাসন-প্রণালী পর্য্যালোচন-স্থলে লিখিয়াছেন যে, আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, পুরাতন রাজাতন্ত্রশীল ইংলণ্ড ক্রমশঃ সাধারণতন্ত্রোন্মুখী

খৃষ্ট-ধর্ম্মের অন্যান্য উপদেশ ও মতামত যেরূপ হউক না কেন, তদ্বিষয় এখানে বিচার্য্য নহে। কিন্তু তাহার যে উপদেশে ইয়োরোপের ভাগ্য ফিরাইয়া দিয়াছে, যাহা ইয়োরোপের সামাজিক স্বাধীনতা-ভাবের মূলমন্ত্র ও বিধান, এবং যদ্দ্বারা ইয়োরোপীয় সামাজিক অবস্থার দিন দিন উন্নতি-সাধন হইতেছে, সেই সুমহৎ ভ্রাতৃভাব যতদিন ভারতীয় সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট না হইবে, ততদিন তাহার সামাজিক মঙ্গল সাধন প্রকৃতপক্ষে আরব্ধ হইবে না। যতদিনে না এই মূলমন্ত্র দ্বারা সামাজিক স্বাধীনতার বীজ রোপিত হইবে, ততদিন স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় ভাবের উদ্রেক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; এবং যতদিন ভারতে স্বাধীনতানুরাগ, স্বদেশানুরাগ, ও স্বজাতি-প্রেমের উদ্রেক না হইবে, ততদিন তাহার প্রকৃত সামাজিক ও পার্থিব মঙ্গল সাধিত হইবে না।

অমরা এই চিন্তায় যে তিন প্রকার স্বাধীনতার ভাব প্রকটিত করিলাম, যতদিন না আমরা স্বকীয় উদ্যোগে সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্নশীল হইব, ততদিন আমাদিগের মধ্যে প্রকৃত সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি আরব্ধ হইবে না। ইহার প্রয়াসী হইয়া আমরা স্বাতন্ত্র্য

হইতেছে, এদিকে নূতন সাধারণতন্ত্রশীল ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স ক্রমশঃ রাজ্যতন্ত্রোন্মুখী হইয়া আসিতেছে।—Vide Horace White's contribution to the Fortnightly Review Sep. 1, 1875 on "An American's Impressions of England."

অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিব, স্বাবলম্বন শিক্ষা করিব, এবং স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্রতার পথে অগ্রসর হইব। যত দিন পারিবারিক অধীনতায় থাকা প্রয়োজন, ততদিন তাহাতে প্রবৃদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিব। সেই পারিবারিক অধীনতায় সন্তান সন্ততিগণকে স্বাধীনতার পথ শিক্ষা দিব এবং তাহারা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইলেই তাহাদিগকে স্বতন্ত্রতার পথে স্থাপিত করিব। যাহাতে সমাজ মধ্যে স্বাধীনতার-ভাব প্রস্ফূরিত হয়, যাহাতে প্রকৃত সামাজিক স্বাধীনতা-লাভে আমরা কৃতার্থ হইতে পারি, এরূপ উপায় সকল এক্ষণে অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সমাজ মধ্যে যখন আমরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিব তখন আমরা প্রকৃত আন্তরিক বলে বলীয়ান হইব। সমাজ মধ্যে স্বাধীনতার ভাব, কি কথোপকথনে, কি কার্য্যে, কি দৃষ্টান্তে, সর্ব্ব-বিধায়ে যতই উদ্রিক্ত করিতে পারিব, ততই এদেশের উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে, ততই আমরা সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে উপযুক্ত হইতে থাকিব, যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা না হইলে, কোন মানব-জাতি গৌরবে উত্থিত হইতে পারে না, কোন দেশ স্বতন্ত্র দেশের প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, এবং কোন সমাজ সম্পূর্ণ প্রকৃত সুখলাভে অধিকারী হইতে পারে না।

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ আমরা স্বদেশীয় সমাজের সাধারণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি। আমাদিগের এই সমাজ যে আর একটী বিশেষ দোষে

দূষিত রহিয়াছে, তদ্বিষয় এতক্ষণ আমরা পর্য্যালোচনা করি নাই। এই দোষ অপনীত না হইলে সম্পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা কখনই লাভ করা যাইতে পারে না। এক্ষণে আমরা দেখি আমাদিগের বামাজাতি কিরূপ ঘোর অধীনতায় অবস্থিত আছে। এই ঘোর বামাজাতীয় অধীনতা যতদিন সমাজ-মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সমাজের অর্দ্ধভাগ অবনতির নিম্নদেশে নিমজ্জিত থাকিবে। ততদিন এই অধীনতার দৃষ্টান্তে সকল স্বাধীনতার ভাব বিনষ্ট ও কলঙ্কিত হইতে থাকিবে, ততদিন বামাজাতীয় প্রভাব সমাজ-মধ্যে বিলক্ষণ কার্য্য করিতে থাকিবে, এবং ততদিন সেই সমাজ কখনই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে না।

ষষ্ঠ চিন্তা—বঙ্গবামা।

কুক্ষণে বঙ্গবালা জন্ম পরিগ্রহ করে। পুত্রসন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিলে সকল পুরজনেই প্রফুল্লিত হয়েন, কিন্তু কন্যা জন্মিলে সকলেরই মুখ মলিন হয়। প্রসূতিও বিষণ্ণা হয়েন, জনকেরও মুখ ম্লান হইয়া যায়। কন্যার জন্মের সঙ্গে পিতার মনে শত ভাবনা উপস্থিত হয়। বঙ্গ-কামিনীর সমস্ত দুর্দ্দশা যেন তাঁহার হৃদয়াকাশে একদা চিত্রিত হয়। তিনি নিজ কন্যার পক্ষে সকলই সম্ভাবিত জ্ঞান করেন। তাঁহার মস্তকোপরি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়। পৌরজন বলিয়া উঠে, "একটা মেয়ে হয়েছে" আত্মীয় ও প্রতিবেশিনীগণ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান। বর্ষীয়সীগণ তামাসা করিয়া জনককে বলিতে থাকে "টাকার সম্বল কর।" জনক সে কথায় হয় ত হাসিয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছে। জননী পূর্ব্বে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন—আমার কখন কন্যা হইবে না, কন্যা হইলে তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব। এখন তিনি সেই কন্যা প্রসব করিলেন। স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ এবং লোকলজ্জা ভয়ে তিনি কিছু করিতে বা বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহার অনাদর জন্মিল। মাসকলায়ে পোকা ধরে না বলিয়া তিনি সূতিকা গৃহেই শিশু-সন্ততির প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতির হস্তে যতদূর

হয়, শিশুকন্যার পুষ্টিসাধন হইতে লাগিল। যাহার প্রতি জনক জননীর অনাদর, তাহাকে অন্য কে যত্ন করিবে?

কন্যার প্রতি জনক জননীর এ প্রকার ভাবের কারণ, আমাদিগের স্ত্রীজাতির দুরবস্থা। বাস্তবিক স্ত্রীজাতির অবস্থা আজিও কোন সভ্য সমাজে প্রকৃষ্ট রূপে উন্নত হয় নাই। সকল সমাজেই পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অবস্থা হীনতর। এই হীনতা সমাজ বিশেষে কেবল ন্যূনাধিক রূপে অবস্থান করিতেছে মাত্র। নতুবা কোন সমাজে আজিও এই হীনতা একেবারে অপনীত হয় নাই। অপনীত হইবার বড় উদ্যোগও নাই। কেবল বঙ্গদেশে কেন, সকল সভ্য সমাজেই, কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তানের জন্ম-গ্রহণ অধিকতর আদরণীয় হয়। যে সমাজে স্ত্রীজাতির যে পরিমাণে দুর্দ্দশা; সে দেশে সেই পরিমাণে তাহার প্রতি অনাদর। কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিলে সকল সমাজেই ন্যূনাধিক রূপে আহ্লাদের পরিবর্ত্তে বিষণ্ণতার চিহ্ন উপলক্ষিত হয়। যে সমস্ত জাতি সভ্যতম বলিয়া ভাণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও মধ্যে স্ত্রীজাতির সম্যক্ উন্নতি সাধিত হয় নাই বলিয়া এই বিষণ্ণভাবের অভাব দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশে এরূপ ভাব লক্ষিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এই দুর্দ্দশার কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীত হইবে যে, পুরুষজাতি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির অধীনতাই ইহার মূল। পৃথিবীর ইতিবৃত্তে প্রকাশিত হয় যে, পুরুষজাতিই আবহমান কাল প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। কি সমাজ, কি

ব্যবহার, কি রাজকার্য্য, সকল বিষয়ে পুরুষজাতিই প্রভু। পুরুষজাতির প্রবলতা হেতু স্ত্রীজাতির অধীনতা সংঘটিত হইয়াছে। সমাজে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, দেশে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, এবং স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের যে সমস্ত ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, সে সমস্ত পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, তৎসমস্তেরই মূলে এই অধীনতার ভাব নিহিত আছে। সে সমুদায় ব্যবস্থা, আচার, ব্যবহার ও রীতি কেবল পুরুষজাতি কর্ত্তৃক সংরচিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা স্ত্রীজাতিকে ক্রমশঃ কঠিনতর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে। কেবল পুরুষজাতির অধিকতর সুখ-সমৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। তৎসমস্ত পুরুষজাতির যতদূর পক্ষপাতী স্ত্রীজাতির ততদূর নহে। পুরুষজাতির স্বার্থ ও প্রয়োজন সাধনোদ্দেশেই ইহাদিগের সৃষ্টি। এজন্য ইহারা স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত হইয়াছে। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহাদিগকে ধর্ম্মতঃ বৈধ বলা হয়। কিন্তু কে বলে? যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা তাঁহারাই ইহাদিগকে ধর্ম্মবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণকার স্ত্রী এবং পুরুষজাতি সম্বন্ধীয় নৈতিক সমাজ যে নিশ্চয় ভ্রমসঙ্কুল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। স্ত্রীজাতিকে অধীন বিবেচনায় পুরুষজাতি যে সমস্ত স্বার্থপর ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থার অনুসারে এক্ষণে উভয়জাতীয় সম্বন্ধ নিরূপিত ও পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি যখন স্বাধীনভাব ধারণ করিবে,

এবং সেই ভাবে যখন পুরুষজাতির ব্যবস্থা সকল পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, তখন যে মানবীয় নৈতিক সমাজের কি গণ্ডগোল ঘটিবে, কে বলিতে পারে? স্ত্রীজাতি যখন নিজে নিজে বিচার করিতে শিখিবেন, পুরুষজাতির সহিত যখন তাঁহাদিগের অধিকার, মতামত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচিত ও অবধারিত হইতে থাকিবে, তখন বাস্তবিক পৃথিবীর যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। তখন স্ত্রী ও পুরুষজাতি সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যপথ, ধর্ম্মের পথ ও ব্যবস্থা নির্ণীত হইবে। এক্ষণে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থমূলক। যাহা কেবল স্বার্থের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, সে ব্যবস্থা ও নিয়ম কখন ধর্ম্মবৈধ হইতে পারে না। স্বাধীন স্ত্রীজাতির সহিত বিচারে এবং বিতণ্ডায় যাহা স্থিরীকৃত হইবে তাহাই নিঃস্বার্থ ও বৈধ। তদ্ভিন্ন স্ত্রী এবং পুরুষজাতীয় ব্যবস্থাবলি কখন স্বার্থপরতা-পরিশূন্য হইতে পারে না। যে ব্যবস্থাবলি যত স্বার্থপরতা-পরিশূন্য তাহাকে তত ধর্ম্মতঃ বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এজন্য এক্ষণে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা কতদূর ন্যায়ানুগত ও বিশুদ্ধ তাহার স্থিরতা নাই। স্ত্রীজাতির জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রবল না হইলে তাহার স্থিরতার সম্ভাবনাও নাই। পুরুষজাতি সহজে কখন স্ত্রীজাতিকে অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিবে না। মনুষ্যসমাজ যদি কখন স্বার্থশূন্য হয় তবে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা। স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও অধিকার লইয়া আজি কাল সভ্যসমাজে ঘোর

বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। মিল্, স্পেন্সর, কিঙ্গিস্‌লে, এবং মরীস্ প্রভৃতি মহোদয়গণ স্ত্রীজাতির পক্ষে ঘোর বিচার উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রবল ধ্বনি ক্রমশঃ দিগন্তব্যাপী হইতেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সভ্যসমাজে এত দিনের পর, ও এত কালের জ্ঞানা-লোচনার পর, এক্ষণে পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির বিতণ্ডা ঘটিবার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। আজিও স্ত্রীজাতির জ্ঞানজ্যোতিঃ নিতান্ত দুর্ব্বল ও ম্লান। ক্রমে যত এই জ্যোতিঃ প্রবল হইতে থাকিবে তত সমাজ সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীসমাজে তবু অনেক দূর স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্ত্রীসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেবল অশ্রুপাত করিতে হয়। এখানে কেবল দাসীত্ব ও পশুবৎ আচরণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। সমাজের সহিত স্ত্রীগণের কোন সম্বন্ধ নাই। গৃহে তাহারা পশুর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। পুরুষজাতির অধীনতা, সেবা ও শুশ্রূষাই তাহাদিগের ধর্ম্ম ও জীবনের সমুদায় কর্ম্ম। এই উদ্দেশে কি তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে? আহা! তাহাদিগের অবস্থা কি শোচনীয়! তাহাদিগের জ্ঞানান্ধতা কি গভীর!

অতি শৈশবাবস্থা হইতেই আমরা নারীগণকে পুরুষ-জাতির অধীনতা শিক্ষা দিই। জনক জননী তাহাদিগকে এরূপে লালন পালন করেন, যেন তাহারা শ্বশুরালয়ে সকলের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিতে পারে। শিশু-

কারণেই তাহাদিগের সাহস, বিক্রম ও তেজঃ খর্ব্বীকৃত করা হয়। বাস্তবিক সর্ব্ব বিধায়ে যাহাতে তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া শ্বশুরালয়ে আবদ্ধ থাকিবার উপযোগিনী হয়, এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। সহোদরের নিকট সহোদরা অতি দুর্ব্বলা। জনক জননী তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়া তুলেন। পুত্রসন্তান অধিকতর প্রশ্রয় পায়। কন্যাগণ অধিকতর সংযমিত হইতে থাকে। শুদ্ধ ইহাই নহে, অতি অল্প বয়স হইতেই ইহারা কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতি অল্প বয়স হইতেই বালকগণের সঙ্গ হইতে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্না করা হয়। বালিকারা একটী স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠিত করে। গৃহিণী অথবা বয়স্কা স্ত্রীগণ ইহাদিগের আদর্শস্বরূপ হয়। এই সময় হইতেই ইহাদিগের চরিত্র কলঙ্কিত হইতে থাকে।

এতদ্দেশে যে বালিকাবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে কোন মতে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। কারণ, অজ্ঞানাবস্থায় যাহা কৃত হয় তাহা সিদ্ধ নহে। বালিকাগণ যখন বিবাহ করে তখন তাহারা জানেনা, আমরা কি করিতেছি। অপরাপর ক্রীড়ার ন্যায় পরিণয়সংস্কারও তখন তাহাদিগের নিকট একটী প্রমোদরূপে প্রতীয়মান হয়। শৈশবাবস্থায় খেলিবার সময় তাহারা আমোদ করিয়া এরূপ কতবার বিবাহ করিয়াছে। প্রকৃত বিবাহ কালে তাহারা ইহার পুনরভিনয় করে মাত্র। কোন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের সেই ক্রীড়ার প্রতি যে প্রকার ইচ্ছা থাকে, এই পরিণয়েও তাহাদিগের

তদ্রূপ ইচ্ছা ব্যতীত আর অধিক কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। দশ এগার বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তাহাদিগের কোন বিষয়েই চৈতন্য ও বিবেচনা হয় না। সে সময়ে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেও তাহারা তদ্বিরুদ্ধে দ্বিরুক্তি করিতে সমর্থা নহে। সমর্থা হইলেও সাহসিনী নহে। পিতা মাতাও যে তাহাদিগকে সর্ব্ব সময়ে সৎপাত্রে প্রদান করেন এরূপ নহে। তাঁহাদিগকে দেশের রীতি ও আচার ব্যবহারের অধীন হইতে হয়। তাঁহাদিগের অবস্থার উপরও অনেকদূর নির্ভর করে। তাঁহাদিগের প্রকৃতি, লাভালাভ বিবেচনা, শিক্ষা ও রুচির উপরও অনেক পরিমাণে কন্যার বিবাহ নির্ভর করে। পিতা যদি অর্থলোলুপ হন, তাঁহার কন্যার বিবাহ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। পিতা যদি বৃদ্ধ হন তবে হয় ত মনে করেন, আমি ত দায়মুক্ত হই, আমাকে অধিককাল কিছুই দেখিতে হইবে না, কন্যার কপালে যা থাকে তাহাই ঘটিবে। এই প্রকার বিবেচনায় ও নিজ অবস্থার সঙ্কীর্ণতা হেতু কন্যাকে হয় ত চিরদিনের জন্য জলে ভাসাইয়া দেন। যে হত-ভাগিনী বালিকা আবার পিতৃহীনা, তাহার বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার যতদূর সম্ভাবনা, তাহা আর বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। জীবনের একটী প্রধান কার্য্য বিবাহ,—তাহাতেও স্ত্রীজাতি এই প্রকার পরের নিকট সম্পূর্ণ অধীন। বিবাহ ভালই হউক, আর মন্দই হউক, বালিকারা জানে না কি হইতেছে। তাহাদিগের তখন

বিবেচনার শক্তি নাই, কোন কথা বলিবার শক্তি নাই, বলিলে সে কথা রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেহ বুঝাইয়া দিলে আপনাদিগের কোন বিহিত ও প্রতিবিধান করিবারও সামর্থ্য নাই। তখন তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত অধীন। সুতরাং তাহাদিগের এপ্রকার অবস্থায় ও সময়ে বিবাহ দেওয়া যে নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অবৈধ, তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। দেশের রীতি নীতি ইহাকে বৈধ বলুক, সদ্বিবেচনায় ইহাকে কখন বৈধ বলা যাইতে পারিবে না। যে কার্য্য স্বকীয় বিবেচনা ও ইচ্ছার অনুমত নহে, যাহাতে আপনার কিছুই আয়ত্তি নাই, পরের নিতান্ত বাধ্য হইয়া যাহা সম্পন্ন করিতে হইতেছে, সে কার্য্যের কি কিছু ধর্ম্মনৈতিক বন্ধন আছে? বালিকাবিবাহের যদি ধর্ম্মনৈতিক কিছু মূল্য থাকে, তবে কোন কার্য্যেরই ধর্ম্মনৈতিক মূল্য নাই। শুদ্ধ পশুবৎ বলপ্রয়োগে যদি কেহ তোমায় কোন গর্হিত অথবা শুভ কার্য্য করায়, তবে সে কার্য্য কি তোমার কৃত বলিবে? না সে কার্য্যে কোন ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম আছে? পরিণত-বয়স্কা অনেক রমণী অনুতাপ করেন, কেন পিতা মাতা তাঁহাদিগের সে প্রকার বিবাহ দিয়াছিলেন। অবিবাহিতা হইয়া অথবা বিধবা হইয়া চিরকাল অতিকষ্টে অবস্থান করাও তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। কোন হিন্দুনারী যদি বয়স্কা হইয়া এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করেন, যে আমার অজ্ঞানাবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমার যে বিবাহ দিয়াছেন, তাহা আমার জ্ঞানাবস্থায়

অনভিমত, অতএব তাহা সিদ্ধ কি অসিদ্ধ? এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আইনে যাহাই বলুক, বিচারপতি প্রকৃত ব্যবহার-তত্ত্বের উপদেশানুসারে সে বিবাহকে কখন সিদ্ধ বলিবেন না। বাস্তবিক এরূপ বিবাহে যে নারী আবদ্ধ হইয়াছেন, ন্যায় মতে তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন। যেহেতু প্রকৃত কল্পে তাহার বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই। বেদবিৎ দয়ানন্দ সরস্বতী কহিয়া গিয়াছেন এপ্রকার বিবাহসংস্কার বেদবিহিত নহে। বৈদিক সময়ে ইহা প্রচলিত ছিল না। ঠিক্ কোন্ সময়ে ইহা এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। অনুমান হয়, ইহা পৌরাণিক কালের ফল। রঘুনন্দন, বোধ হয় ইহা এতদ্দেশে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন। যে সময়েই হউক, ইহা যে ন্যায়ানুমত নহে ও যথার্থ ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা পুরুষজাতি না হউক জ্ঞানবতী স্ত্রীলোকমাত্রই মুক্তকণ্ঠে উচ্চরবে বলিয়া উঠিবেন। পক্ষপাতশূন্য সদাশয় পুরুষগণও ইহা স্বীকার করিবেন।

কেবল স্বার্থপর পুরুষজাতীয় সাধারণ জনগণ ইহার প্রতিবাদে উদ্যত। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া বলিতে আসিবেন, কৃতসংস্কার স্ত্রীগণের পাণিগ্রহণ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না, তাহাতে ঘৃণা বোধ হয়। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিলে তাহাদিগের কলঙ্কিতা হইবার সম্ভাবনা। বালিকাবস্থা হইতে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের পবিত্রতা সুরক্ষিত হয়। এজন্য তাহাদিগের অল্প বয়সেই বিবাহ হওয়া উচিত।

এই কথাগুলিতে ঘোর স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে। আমরা ভার্য্যাকে নিষ্পাপ ও নির্ম্মলা চাই। আমরা নিজে যা ইচ্ছা তাই হই না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। পাপী হই বা নিষ্পাপী হই, বৃদ্ধ হই বা অল্পবয়স্ক হই, আর দুই বা ততোধিক বার দার-পরিগ্রহ করিয়া থাকি, আমরা অবশ্য গ্রহণীয়। কিন্তু নারীজাতি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলে আর গ্রহণীয়া নহে। কেন নহে, কারণানুসন্ধান করিলে মূলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষজাতির প্রবৃত্তি নাই এই জন্য। পুরুষজাতি প্রবল জাতি, তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি অবশ্য প্রবলা হইবে। তাঁহাদিগের বাক্যই নিয়ম, তাঁহাদিগের ব্যবস্থাই ধর্ম্ম। কি স্বার্থপরতা! ধর্ম্ম কি স্বার্থপরতার প্রতিবাক্য মাত্র?

বালিকাবিবাহের ফলাফল গণনা করিয়া আমরা তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিতে চাহিনা। সে বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীজাতির আধুনিক ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা কি, ইহা আলোচনা করিতে গেলে প্রতীত হইবে যে, পুরুষজাতি তাহাদিগকে যে ঘোর অন্ধ ও জড়ভাবে অবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই অস্বাভাবিক অবস্থাই তাহাদিগের বৈধ, তদ্বিপরীত অবস্থা অবৈধ বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এবিষয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ আমাদিগের বামাগণের সতীত্ব ধর্ম্ম।

আমরা ভাণ করিয়া থাকি, আমাদিগের রমণীগণ

সতীত্ব ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠতম। বঙ্গকামিনীকে সতী বলিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত, তাহার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা কি, এবং আমাদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের ভাব কি প্রকার?

বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া আমরা তাহাকে যেন পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখি। বহুকাল ধরিয়া অন্তঃপুরী মধ্যে তিনি অবগুণ্ঠনবতী রহেন। শ্বশুরালয়ে অনেক দিন অতিবাহিত না করিলে দেশের রীত্যনুসারে কাহারও সহিত তাঁহার বাক্যালাপ করিবার যো নাই। পুরুষ-জাতীয় কোন গুরু জনের সহিত কথা-বার্ত্তা কওয়া দূরে থাক, তাহাদিগের সমক্ষে অবগুণ্ঠন বিমুক্ত করিয়া যাইতেও পারেন না। অসাবধানতা বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়ার ছায়া স্পর্শ করিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তদ্রূপ, ভ্রাতৃশ্বশুরের কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেও ভ্রাতৃবধূর প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান আছে। গুরুজন যতক্ষণ অবরোধ মধ্যে অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ নববধূর উচ্চ রবে কথা কওয়াও দূষণীয়। একলা এক দণ্ড অপর পুরুষের সহিত কথা কওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কথা কওয়া দূরে থাক, সম্মুখে যাওয়াও বৈধ নহে। বাহিরের পরিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিবার নিমিত্ত গবাক্ষ-দ্বারে ক্ষণকাল অবস্থান করিলে, তাঁহার অপযশ হয়। পল্লীর মধ্যে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। জনসমাজ কেমন তাহা নারীজাতি কিছুই অবগত নহে। প্রেম-বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হইয়া আমরা নারীজাতিকে নিতান্ত অধীন করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা কেবল জ্ঞানে অন্ধ নহে, পৃথিবীর

সমস্ত বিষয়েই অন্ধ। তাহারা অন্ধকারে জীবন পরিগ্রহ করিয়া, অন্ধকারেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে। জনসমাজের সহিত যাহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই, চিরদিন একাকিনী গৃহমধ্যে যাহাদিগের পশুবৎ অবরুদ্ধা থাকিতে হয়, তাহাদিগের জীবন নিতান্ত অধীন ও জড়বৎ নিশ্চেষ্ট বলিতে হইবে। যাহাদিগের এতদূর অধীনতা তাহাদিগের আবার সত্বা কি? যাহারা জনসমাজের কিছুই অবগত নহে, যাহাদিগের ভাল মন্দ এবং সদসৎ বিবেচনা কিছুই নাই, স্বার্থপর পুরুষের দুই চারিটা উপদেশ যাহাদিগের জ্ঞানের পরিসীমা, গৃহ-ধামের একটী কুটীর মাত্র যাহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র, যাহাদিগের কোন শক্তি নাই তাহাদিগের অধীন জীবনের গৌরব কি? ক্রীত দাসীর ন্যায় যাহারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধা থাকিবে, তাহাদিগের কার্য্যের নিন্দা অথবা প্রশংসাই বা কি? স্বামী ভিন্ন কাহারও সহিত স্ত্রীজাতি বিশ্রব্ধ আলাপ করিতে পায় না। অন্যের সহিত বিশ্রব্ধ আলাপনে তাহাদিগের শত সহস্র প্রতিবন্ধক। স্বামী ভিন্ন শ্বশুরালয়ে বঙ্গবধূর আর কেহই নাই। স্বামী যে প্রকার হউন, তাঁহার নিতান্ত আশ্রিত ও দাসীর ন্যায় অধীন থাকিতেই হইবে। কারণ স্বামী ভিন্ন তাঁহার কোন গতি নাই। স্বামীকে পরিত্যাগ করা স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াও স্বামী অনায়াসে ভদ্রসমাজে পূজনীয় হইতে পারেন। স্বামী অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া রাখিতে পারেন বলিয়া, পাছে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হন, এই ভয়ে স্ত্রী

তাঁহার সর্ব্বথা মনস্তুষ্টি সাধন করিতে ত্রুটি করেন না। পাছে স্বামীর কোন বিষয়ে ত্রুটি হয়, তজ্জন্য স্ত্রী তাঁহার সম্পূর্ণ বাধ্য ও অধীন হইতে স্বীকৃত হন। বৈধব্য দশার আশঙ্কায় পত্নী অহরহঃ স্বামীর পদাশ্রিত থাকেন। দিবা রাত্রি তাঁহার স্বামীর জন্যই ভাবনা। পরের উপর যাঁহার এতদূর নির্ভর, পরের স্বার্থের সহিত যাঁহার নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তাঁহার অনুরাগ ও পতিপরায়ণতা কতদূর বিশুদ্ধ ও হৃদয়গত, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। নিতান্ত অধীনতা নিবন্ধন, স্ত্রীর পরম বিশুদ্ধ প্রণয়ের প্রতিও আমাদিগের একদা সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহার পবিত্র প্রণয়ের সুখে আমরা সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারি না। আমাদিগেরই দোষে আমরা এই সুখে কিয়ৎ পরিমাণে বঞ্চিত হইতেছি। বাস্তবিক আমাদিগের স্ত্রীজাতির পতিপরায়ণতায় এতদূর স্বার্থপরতা বিদ্যমান দেখি যে, তাহা বিশুদ্ধ ও পরম পবিত্র কি না তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ পতি-পরায়ণতা অধীনতার নামান্তর মাত্র। স্বার্থপর পুরুষজাতি এইজন্য ইহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া ইহাকে স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। ধর্ম্ম বলিয়া অনভিজ্ঞা স্ত্রীজাতি ইহা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সমাজের রীতি, নীতি, ও অবস্থার গতিকে বাধ্য হইয়া তাহারা এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ব্রতী হইয়াছে। কিন্তু যদি দাসীত্বের গৌরব থাকে তবে স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য ধর্ম্মেরও গৌরব আছে।

যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই। যেখানে পাপ করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে পুণ্যের গৌরব নাই। যেখানে নড়িবার শক্তি নাই, সেখানে স্থিরভাবে থাকিতেই হইবে। সেরূপ জড়ভাবের আবার প্রশংসা কি? যে স্বাধীন হইতে না পারে, তাহার অধীনতা দাসত্ব। যে যথেচ্ছাচারী হইতে না পারে, তাহার স্বাধীনতা, অধীনতার নামান্তর মাত্র। বাস্তবিক যিনি স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে না পারেন, ধর্ম্মজগতে তিনি জড়বৎ ও মৃতবৎ অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার ধর্ম্মনৈতিক সত্ত্বা কিছুই নাই।

আমাদিগের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে উক্ত বাক্যনিচয় সম্পূর্ণরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। স্বাধীনতার পথে তাঁহাদিগের যে প্রকার অশেষ কণ্টক, তাহা আমরা প্রতীত করিয়াছি। যথেচ্ছাচারিতা কাহাকে বলে, তাহা তাহাদিগের অনুভবও নাই। যদি কিছু স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তাহারা সে স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে সাহসিনী নহে। চির-অভ্যস্ত অধীনতা ও পরবশতা তাহাদিগের নিত্য ও এক প্রকার স্বাভাবিক ভাব হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ তাহাদিগকে অগ্রসারিণী করাও সামান্য কথা নহে। কত যুগান্তর অতীত না হইলে আর আমাদিগের রমণীগণের প্রকৃষ্ট উন্নতি-সাধন হইবে না। তাহাদিগের আধুনিক পশুবৎ ও দাসীর অবস্থায় প্রকৃত ধর্ম্মজীবন অসম্ভব। তাহাদিগের এমত জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি নাই, যদ্দারা ভাল মন্দ বিচার করিয়া লয়।

নিজে সদসৎ বিবেচনায় যাহারা সমর্থা নহে, অগত্যা তাহাদিগকে অপরের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, যাহাদিগের বিবেচনার উপর রমণীগণ নির্ভর করিবে তাহারা অপর জাতি ও একপ্রকার বিপক্ষ জাতি। কারণ, দুই জাতির স্বার্থ কখন এক হইতে পারে না। পুরুষ জাতির যাহাতে সম্পূর্ণ সুখ-স্বচ্ছন্দতা, স্ত্রীজাতির তাহাতে ঘোর অসুখ ও অধীনতা। নারীকুল সম্বন্ধে পুরুষ জাতি যে সমস্ত ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, সে সমস্ত ব্যবস্থা কখন নিস্বার্থ ধর্ম্ম-সঙ্গত হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবেও আমরা এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করি। সংসার-ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে পুরুষ, নারীকে এতদূর অধীন করিয়াছে যে, নারীর আর স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র জীবনের প্রয়োজন, এবং স্বতন্ত্র সুখ নাই। পুরুষের স্বার্থ,প্রয়োজন এবং সুখের সহিত তাহা একীভূত হইয়া গিয়াছে। এক জাতির প্রভুত্বে অপর জাতির সত্তা বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা ও জীবন কিছুই নাই।

যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেখানে যথেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা আমরা অস্বীকার করি না। বাস্তবিক যথেচ্ছাচারী হইবার শক্তি না থাকিলে কেহ স্বাধীন হইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া স্বাধীন হইলেই যে সর্ব্বসাধারণে যথেচ্ছাচারী হইবে একথাও অসম্ভব। একথা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে

যে, সমগ্র পুরুষ জাতি যথেচ্ছাচারী। তাহা যদি সত্য হয়, তবে পুরুষ জাতির স্বাধীনতা অগ্রে হরণ করা আবশ্যক। কিন্তু একথার প্রস্তাব করিতে কে সাহসী হইবে? কাহার সাধ্য পুরুষ জাতির স্বাধীনতা হরণ করে? পুরুষের জাতি-সাধারণ স্বাধীনতা পাইয়া তাহার এক সামান্য অংশ মাত্র যথেচ্ছাচারী হইয়াছে বলিয়া স্বাধীনতার গৌরব কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। বরং তাহাতেই প্রতীত করিয়াছে যে, অধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতার অপেক্ষা স্বাধীনতা কত শ্রেষ্ঠ ও সুখকর। যথেচ্ছাচারিতা থাকাতে, স্বাধীনতার গৌরবের বরং সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে স্বাধীনতার সুফল ও মঙ্গল যেমন দেদীপ্যমান হইয়াছে, কেবল অধীনতায় তেমন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধেও একথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলে যে তজ্জাতিসাধারণ যথেচ্ছাচারিণী হইবে, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা ইহার ঠিক বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করি। কিয়দংশ পতিত হইয়াও যদি জাতিসাধারণ স্বাধীন হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মপথে উত্থিত হয় তাহা কি শ্রেয়স্কর নহে? কিন্তু পুরুষজাতি নিতান্ত বিদ্বেষী, নিতান্ত স্বার্থপর ও অহঙ্কারী। বামাকুলের স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা তাহার অসহ্য। পুরুষের স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা নারীর অসহ হইলেও তাহার সহিষ্ণুতার গুণে তাহাকে সকলই সহ্য করিতে হইবে। পুরুষে সে প্রকার সহিষ্ণু হইতে পারেন না, কারণ তিনি প্রভু।

পুরুষ জাতি সহসা আপনাদিগের একাধিপত্য বিনষ্ট করিতে পারে না। আমরা বলি, পুরুষ জাতি যে এতকাল ধরিয়া একাধিপত্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট, ইহাই তাহাদিগের গর্ব্ব। গর্ব্ব—না কলঙ্ক? হায়! এতকালের পর বুঝি সেই একাধিপত্যে কুঠারপাত আরম্ভ হইয়াছে। যিনি আমেরিকার স্ত্রীসমাজের প্রতি দৃষ্টি করিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন, সেখানে স্ত্রীজাতি যে প্রকার স্বাধীনভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি; ত্বরায় আমেরিকার ধর্ম্ম-নৈতিক সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। "আমাদিগের রমণীগণ যথেচ্ছাচারিণী হইল" বলিয়া এখনই আমেরিকার পুরুষগণ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার স্ত্রীজাতি সে রবে ভীত নহে। তাহারা বুঝাইয়া দিতেছে যে, যাহা পুরুষজাতি যথেচ্ছাচারিতা বলিয়া রটনা করিতেছে তাহা কেবল অপেক্ষাকৃত অধীনতার হ্রাসমাত্র। আমরা স্বীকার করি, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলে প্রথমে অনেক পরিমাণে যথেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা বটে, যেহেতু তাহা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। শৃঙ্খলভগ্ন পশু একবার দৌড়িয়া বিচরণ করিয়া আইসে। সরস ক্ষেত্রে একবার তৃণজাত উদ্দামিত হইয়া উঠে। যৌবনকালে রিপুগণের প্রাবল্য হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, ইহা অনিবার্য্য। কিন্তু তা বলিয়া কি করিব? কিছুকাল পরেই পশু বশ্য হয়, ক্ষেত্র ফলবতী হয়, এবং যৌবন প্রৌঢ়াবস্থায় পরিণত হয়। এতকাল যাহাদিগকে ঘোর অধীনতাশৃঙ্খলে

আবিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিছুকাল তাহাদিগের যথেচ্ছাচারিতা সহ্য করিতে আমরা এত কাতর হই কেন? আমরা যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, সেই দুষ্কৃতির ফল-ভোগের জন্য আমাদিগের শঙ্কিত হওয়া উচিত নহে। আমরা যদি একবার এই ফলভোগ করিয়া সহিয়া থাকি, অনতি-বিলম্বেই চিরদিনের জন্য প্রকৃত সুখের সম্ভোগী হইব। কিছুকাল অতীত হইলেই, স্ত্রীজাতি প্রকৃত স্বাধীনভাব অবলম্বন করিবে। প্রথমে যদি তাহারা বহুসংখ্যায় যথেচ্ছাচারিণী হয়, ক্রমশঃ তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত শীতল হইবে।

আমেরিকাতে এখনই স্ত্রীজাতির জ্ঞান-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এখনই শত সহস্র বামাগণ পুরুষের সহিত আপনাদিগের অধিকার সম্বন্ধে ঘোর বিতণ্ডা উত্থাপিত করিয়া জনসমাজ বিলোড়িত করিয়া দিতেছে। পুরুষের জনসমাজ মধ্যে যে পরিমাণে পাপস্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই বিতণ্ডায় তাহারা অনেক সময় জ্ঞানবলে আপনাদিগের পক্ষ চমৎকার কৌশলে সমর্থন করিতেছে। অনেক বার তাহারা জয়লাভও করিয়াছে। এদিকে পুরুষজাতি তাহাদিগের কলঙ্ক রটনা করিয়া কতই পুস্তক প্রচার করিতেছে। বামাগণ সেই সকল গ্রন্থের সদুত্তর দিয়া আপনাদিগের দোষ ক্ষালন করিতেছে। এখন এই জ্ঞান-যুদ্ধ বহুকাল চলিবে। ইহার সূত্রপাত মাত্র এই। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, ইহা হইতে ভবিষ্যতে

ঘোর গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। সামাজিক বিপ্লবে যে সমস্ত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা তাহা, সকলই ঘটিবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিয়া যদি পরিণামে মঙ্গল হয়, তাহাও শ্রেয়। ইয়োরোপে এই তরঙ্গ একদিন উত্থিত হইবে, ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু এসিয়ায় যখন এই তরঙ্গ উত্থিত হইবে, তখন বোধ হয়, গ্রহে গ্রহে বিঘর্ষণ হইলে যেমন ভীষণ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ ভয়ানক সামাজিক ভূকম্পনে দেশ আন্দোলিত করিয়া ঘোর প্রলয় উৎপন্ন করিবে। এপ্রকার সামাজিক বিপ্লব না ঘটিলে, ভারতবর্ষের কখন প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত ধর্ম্মের পথে সহস্র কণ্টক স্থাপিত থাকুক, প্রকৃত সত্যের পথ ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন থাকুক, প্রকৃত ন্যায়ের পথে সহস্র প্রতিবন্ধক থাকুক, সে পথ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইবেই হইবে, এই আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। পৃথিবী বহুকাল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক, বহুকাল ধরিয়া পাপকলুষিত ব্যবস্থাবলি তাহাতে প্রভুত্ব করুক, কিন্তু এমত সময় উপস্থিত হইবে, যখন সেই তিমিরাবলি জ্ঞানবিস্তার ঈষৎ কটাক্ষে ক্রমে তিরোহিত হইতে থাকিবে, যখন ধর্ম্মের জয় এমত উচ্চ-রবে প্রতিঘোষিত হইবে যে, সেই কলঙ্কিত ব্যবস্থাবলি লজ্জায় পলায়ন করিবারও পথ পাইবে না। জনসমাজের শত সহস্র লোক কেন কুপথে পদার্পণ করুক না, শতসহস্র লোক সমবেত হইয়া কেন কোন দূষিত মতের পোষকতা

করুক না, কিন্তু সত্য মত যদি পৃথিবীতে একবার ক্ষীণ-রবেও ধ্বনিত হয়, সে রব ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইবে। কিছুতেই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। গ্যালিলিও কারাবাসে নিযন্ত্রিত হইল বটে, কিন্তু তদবলম্বিত সত্য মত অপ্রচারিত রহিল না। প্রমাদ বশতঃ জনগণ মনে করিয়াছিল আমরা স্থির রহিয়াছি, কিন্তু তা বলিয়া পৃথিবীর কিছুতেই গতিরোধ জন্মিল না। পৃথ্বীবাসিগণের বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও মেদিনী গ্যালিলিওর কথা প্রমাণার্থই যেন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দৈনন্দিন গতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ডেকার্টের মতাবলি যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন নাস্তিক বলিয়া তিনি হলণ্ডে কতই না নিপীড়িত হইয়াছিলেন। ইউট্রেটের সেই পাষণ্ড ভোয়িটস তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। হার্ভি একদা বিদ্রূপের জ্বালায় জ্বালাতন হইলেও জনসমাজ ক্রমশঃ রক্তের চলাচলের সত্যতা উপলব্ধি করিতে লাগিল। বাস্তবিক সত্য যদি একবার পৃথিবীতে ধ্বনিত হয়, সে সত্য কখন অপ্রকাশিত থাকিবার নহে। স্ত্রীজাতি যদি এতকাল নিপীড়িত হইয়া থাকে, তাহাদিগের অধিকার যদি পুরুষ-জাতির সহিত বাস্তবিক সমান হয়, তাহারা যদি স্বাধীনতা পাইবার উপযোগিনী হন, আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস এই, তাঁহাদিগের অবস্থা অবশ্য উন্নত হইবে। আজি কেন জনসমাজে বিরুদ্ধমত প্রচলিত থাকুক না, সে মত কখন সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্ম মতের প্রভাবে তিষ্ঠিতে পারিবে না।

ঐ শুন কবিবর ভিক্টর হিউগো কি বলিতেছেন। সে দিন ইয়োরোপীয় বামাকুল-উন্নতি-সাধিনী সভা তাঁহাকে একখানি পত্র লেখে। স্ত্রীজাতির সহায়তায় কবিবর যদি তাঁহার লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করেন, যদি তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি জনসাধারণকে তৎপক্ষে উত্তেজিত করেন, এইরূপ অনুরোধ করিয়া উক্ত সভা কবিবরকে যে একখানি পত্র লেখেন তাহার প্রত্যুত্তরে দেখুন ভিক্টর হিউগো কেমন সদ্ভাবসম্পন্ন একখানি প্রতিলিপি প্রেরণ করেন।

"মান্যা মহিলাগণ! আপনাদিগের পত্র পাইয়া আমি আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছি। আপনাদিগের যে সমস্ত উচ্চ অধিকার, যাহার অভাবে আপনারা যথার্থই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। আজি পর্য্যন্ত আমাদিগের সমাজ যেরূপে সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে বাস্তবিক স্ত্রীজাতির অত্যন্ত হীনাবস্থা স্বীকার করিতে হয়। এজন্য আপনাদিগের উন্নতি-প্রার্থনা নিশ্চয় যুক্তিসিদ্ধ। আমি যদিও পুরুষ বটে, কিন্তু আপনাদিগের যে সমস্ত ন্যায্য অধিকার তাহা আমি জানি, এবং সেই সমস্ত সামাজিক অধিকার যাহাতে আপনারা প্রাপ্ত হন, তৎসাধনে যত্নশীল হওয়া আমার কর্ত্তব্য। অতএব আপনারা আমার সদভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভালই করিয়াছেন। পুরুষজাতি যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোচ্য বিষয় ছিল, স্ত্রীজাতি তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর

আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। এই বিষয় অত্যন্ত গুরুতর। ইহার সিদ্ধান্তের উপর ভবিষ্যতের সমুদায় সামাজিক অবস্থা নির্ভর করিতেছে। ইহাতে একটা প্রকাণ্ড সামাজিক সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। এপ্রকার সংগ্রামে মনুষ্যনামের গৌরব আছে। আমাদিগের সামাজিক অবস্থা কি বিচিত্র! কি অসঙ্গত! বাস্তবিক পুরুষজাতি, স্ত্রীজাতিরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পুরুষ জাতির হৃদয়ের রশ্মি স্ত্রীজাতিরই হস্তে। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থাবলি নারীকুলকে যেন নাবালক জ্ঞান করে। অক্ষম, সামাজিক-শক্তিবিহীন, রাজকীয়-অধিকার-শূন্য, এমত কি, তাঁহারা কিছুই না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গৃহধামে ও পরিবারমণ্ডলে নারীগণের কর্ত্তৃত্বই অধিকতর, সেখানে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা। কারণ, তাহারাই সন্তান সন্ততির জননী। তাহাদিগেরই হস্তে পারিবারিক শুভাশুভ, ও সুখ দুঃখ সকলই নির্ভর করে। যে ব্যবস্থাবলি সেই সরলা বামাগণকে এত দুর্ব্বল করিয়াছে, সে ব্যবস্থাবলি নিতান্ত দূষিত। নিশ্চয় তাহাদিগের সংস্কার আবশ্যক। এক্ষণে বামাজাতির সামাজিক দুর্ব্বলতা আমাদিগের স্বীকার করা উচিত, এবং সেই দুর্ব্বলতা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাও বিধেয়। প্রকৃত মানুষের এই কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য-সাধনে তাহার লাভও আছে। আমি চিরকালই বলিব যে, আপনাদিগের বিষয় এক্ষণে বিচার্য্য এবং সেই বিচারের সিদ্ধান্ত আবশ্যক। যাহাদিগের উপর সকল বিষয়েরই অর্দ্ধেক ভার রহিয়াছে,

তাহাদিগকে অবশ্য সামাজিক সমস্ত অধিকারেরও অর্দ্ধভাগী করা বিধেয়। এ বড় আশ্চর্য্য যে, মানব-জাতির অর্দ্ধভাগ হীনতর হইয়া রহিয়াছে। সমান অধিকার তাহাদিগকে অর্পণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এ যদি সম্পন্ন হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহা হইলে একটী সুমহৎ অনুষ্ঠান হইয়া যাইবে। পুরুষ জাতির অধিকার যেরূপ, স্ত্রীজাতিরও অধিকার তদ্রূপ প্রবলভাবে সুরক্ষিত হয়, এবং সামাজিক ব্যবস্থাবলি যেন দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় নিয়মিত ও সুনীতির অনুমোদিত হয়, এই আমার প্রার্থনা। আপনারা অনুগ্রহ পুরঃসর আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

ইয়োরোপীয় ইদানীন্তন বামাকুলের অবস্থা, তথাকার সহৃদয় জনগণের সদভিপ্রায়, সময়ের গতি এবং সামাজিক ব্যবস্থাবলির প্রকৃতি,—এ সমস্তই এই পত্রিকায় প্রতীত হইতেছে। তাহার সমগ্র পরিচয় দেওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইয়োরোপে বহুকাল ধরিয়া বামাগণের হীনাবস্থা জনসমাজে অবিদিত ছিল না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই তাহার রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এতকাল ধরিয়া কিসের চেষ্টা হইয়াছে? যাহাতে সেই হীনাবস্থা হইতে বামাগণ উঠিতে না পারেন, তাহারই অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। মিল্ প্রভৃতি সুধীগণ যে স্বাধীনতার উচ্চরব উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন, তাহা সকল সহৃদয় জনগণের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যখন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র দেখা দিয়াছে, সে অগ্নি কখন

নির্ব্বাপিত হইবার নহে। অনতিবিলম্বে সেই অগ্নি হইতে ধূমোৎপত্তি হইবে। ধূমোৎপত্তির পর তাহা ক্রমশঃই প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে।

সত্যের জয় যদি অখণ্ডনীয়, তবে সে সত্যের গতি প্রতিরোধ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। সে দিন বিলাতে রাজকীয় মহাসভায় বামাজাতির "অনুমতি দিবার" ক্ষমতা লইয়া যে ঘোর বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আপাততঃ স্ত্রীজাতির পরাজয় বলিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে মহিলাগণের পক্ষ আরও প্রবলতর প্রভাব ধারণ করিয়াছে। স্রোতঃ প্রতিরুদ্ধ হইলে তাহা দ্বিগুণ বলে ধাবিত হয়। ইহা কার্য্যের স্বাভাবিক গতি, ইহা অনিবার্য্য। এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির প্রস্তাব এক্ষণে উত্থাপিত করা অনেকে অসাময়িক বলিবেন বটে, কিন্তু তৎপ্রতি-বিরোধে যতই আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তাহাতে বামা-গণের পক্ষ বলসঞ্চয় করিবে এই আমাদিগের বিশ্বাস। আমরা জানি আমাদিগের মত, সাধারণ মতের বিরোধী। কিন্তু সাধারণমত বহুকাল ধরিয়া একই ভাবে সুস্থির হইয়া রহিয়াছে। সেই মতের একবার সঞ্চালন আবশ্যক। সঞ্চালন হইলে তন্মধ্যে যাহা কিছু দূষিত আছে, অনাম সেই দূষিত অংশ বিদূরিত হইবে। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে এই প্রস্তাবের আন্দোলন করেন, এই আমাদের ইচ্ছা। আমরা যদি ভ্রান্ত হই, অবশ্য আমাদিগের ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে, এবং আমাদিগের পূর্ব্বপক্ষ পাষাণের উপর প্রতিস্থাপিত হইবে।

সামাজিক সকল বিষয় হইতেই আমরা বামাগণকে দূরে রাখিয়াছি। সাধারণ জনগণের মত ও বিশ্বাস এই যে, সমাজের সহিত নারীগণের সম্পর্ক নাই। তাহারা গৃহধামে আবদ্ধা থাকিয়া গৃহকার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিবে। এই মতানুসারে আমাদিগের সমাজ সংগঠিত হইয়াছে. রমণীগণকে আমরা কখন বাটীর বহির্দ্বারে আসিতে দিই না। তাহাদিগের রক্ষার জন্য নপুংসকের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও ফল কি? বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, এক জন রাজার নিকট কোন গুরুতর মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, তিনি অমনি জিজ্ঞাসা করিতেন—ইহার মূলে কোন্ স্ত্রীলোক আছেন? সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের মূলে যে স্ত্রীলোক থাকে, বহুদর্শনে তাহার এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। স্ত্রীলোক নহিলে কখন কোন ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত, এবং সমাজের শান্তি-ভঙ্গ হয় না। স্ত্রীজাতিকে নিতান্ত গোপন করিয়া রাখাই ইহার কারণ। স্ত্রীজাতিও যদি পুরুষের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্থানে প্রকাশ্য ভাবে গমনাগমন করিতে এবং নিশিন্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা কখন সামাজিক শান্তিভঙ্গের কারণ হইত না। পুরুষের মত তাহাদিগকেও সামান্য জ্ঞান হইত। এক্ষণে রমণীগণ যেমন পুরুষের উপভোগ্য সামগ্রীর ন্যায় বিবেচিত হয়, তাহাদিগের স্বাধীনতা হইলে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তখন পুরুষজাতিও রমণীগণের সমান সম্ভোগ্যরূপে প্রতীয়মান হইবে। তখন সুন্দরী ললনা পরম দর্শনীয় পদার্থ

বলিয়া উপলব্ধি হইবে না। সুন্দরীর একবার দর্শন পাইবার জন্য লোকে লালায়িত হইবে না। এখন যেমন হস্তগত হইলেই দুর্ব্বলা সুন্দরী সম্ভোগ্যা হয়, তখন তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন সুন্দর পুরুষের ন্যায় সুন্দরী মহিলাও সামান্যা হইবে। তখন মহিলাগণ সাহসিনী ও ধর্ম্মবলে বলবতী হইবে। এখন এক জন পুরুষের প্রতি বল-প্রয়োগ করা যেমন কঠিন, তখন স্ত্রীলোকের প্রতিও তদ্রূপ কঠিন হইবে। তখন রমণীগণ কি কায়িক, কি মানসিক, উভয়বিধ বলেই বলবতী হইয়া পুরুষের সহিত সমযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। দেশীয় ব্যবস্থাবলি অবশ্য স্বাধীন স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করিবার উপযোগী হইবে। কারণ, এক বিষয়ের সংস্কার হইলে সকল বিষয়েরই সংস্কার আবশ্যক হয়।

অবলাগণকে আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি, এবং তাহাদিগকে আমরা যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, তজ্জন্যই পৃথিবীতে নানা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদিগেরই জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবী শোণিতপাতে ভাসিয়া গিয়াছে। কত রাজবংশ ধ্বংস হইয়াছে, এবং কত দেশ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। ট্রয় ও লঙ্কার ধ্বংস হইবার কারণ কি?—সুন্দরীর কৃপা-কটাক্ষ লাভের জন্য। সুবিখ্যাত "গোলাপ যুদ্ধকে" কে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল?—মার্গেরেট অব আঞ্জু। ফ্রণ্ডীর যুদ্ধ-ঘটনার কারণ কি?—ফরাশি রাজপ্রাসাদে সুন্দরীদ্বয়ের মন্ত্রণা ও কুহকজাল। হোয়াইটহলে প্রথম

চার্লসের ফাঁসি হইবার মূলে কে ছিল?—তাঁহার রাজ্ঞী—হেনরায়টা মেরিয়া। প্রকাণ্ড ফরাশি বিদ্রোহের অধিনায়কেরা কাহাকে তাহাদিগের পরম শত্রু বলিয়া স্থির করিয়াছিল?—সুন্দরী রাজ্ঞী মেরায়া এনটনেট। সপ্তবর্ষ ধরিয়া যে প্রকাণ্ড যুদ্ধ ব্যাপারে ইয়োরোপ রুধিরস্রোতে ভাসিয়া যায়, কাহার অজেয় রিপুর কারণে তাহা সমুত্থিত হয়?—পঞ্চদশ লুই নৃপতির বিখ্যাত ব্যভিচারিণী। আর আমরা দৃষ্টান্তের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে চাহি না। আমরা অবলাগণকে যে ভাবে রাখিয়াছি, তাহারই ফল-ভোগ করিতেছি। সমাজে আমরা তাহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না, কিন্তু তাহারা কেমন আমাদিগের দাসত্বশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া আমাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছে এবং অশেষ দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতেছে।

স্বাধীনতার সহিতই লোকের সাহস ও বলবৃদ্ধি হয়। সাহস ও বলবৃদ্ধির সহিত লোকের গৌরবও বৃদ্ধি হয়। এখন বিবেচ্য এই, কোন্ সময়ে স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক। যিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, তিনি স্বাধীনতার প্রকৃতি ও নিয়ম অবগত নহেন। অনেকে মনে করেন, অগ্রে বামাগণের সাহস ও বল চাই, তৎপরে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত। আমরা ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী। আমরা বলি অগ্রে স্বাধীনতা দেও, তৎপরে স্বাধীনতা রক্ষার বল ও সাহস ক্রমশঃ স্বতঃই জন্মিয়া উঠিবে। স্বাধীনতাই

স্বাধীনতার শিক্ষার স্থল। স্বাধীনতা থাকিলে জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, সাহস ও স্ফূর্ত্তি সকলই জন্মায়। যিনি কখন না স্বাধীন হইয়াছেন, তিনি স্বাধীনতায় কতদূর বল ও সাহস আবশ্যক করে, কিছুই জানেন না। শিশুগণ যখন হাঁটিতে শিখে, তখন সহস্রবার নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তবে পদগতি অভ্যাস করে। একদিনে তাহাদিগের পদদ্বয়ের বলসঞ্চার হয় না। শিশুগণের পক্ষে হাঁটিতে শিখা যদ্রূপ, স্বাধীন হইতে শিক্ষা করাও তদ্রূপ। অবলাগণকে স্বাধীন হইতে দিলে তাহারা যে প্রথমে সহস্র বার নিপতিত হইবে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও আমাদিগের স্থিরসিদ্ধান্ত যে, তদ্রূপ সহস্রবার নিপতিত না হইলে কখন তাহারা প্রকৃষ্টরূপে স্বাধীনতা-লাভে সমর্থ হইবে না, এবং অগ্রে স্বাধীন হইতে না দিলে তাহাদিগের সম্যক্ ধর্ম্মবল ও সাহস সঞ্জাত হইবে না। অনেকে মনে করেন, অগ্রে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মবলে ও সাহসে বলবতী করি, তৎপরে তাহাদিগের অবগুণ্ঠন বিমুক্ত করিয়া দিব। তখন তাহারা সমাজে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন সময় কখনই উপস্থিত হইবে না। গৃহমধ্যে আবদ্ধা থাকিয়া বামাগণ সম্পূর্ণ ধর্ম্মবলে বলবতী হইতে কখনই পারিবে না। বাহিরে না আসিলে তাহারা জানিতে পারিবে না, কি কি আপদ্ তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। সমাজপথে ভ্রমণ না করিলে কেহ জানিতে পারে না, সে পথে কি

প্রকারে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। পাঁচবার পদস্খলন না হইলে কেহ জানিতে পারিবে না, পথপর্য্যটনে কত সাবধানতা ও বলের আবশ্যক। তবে যদি স্ত্রীজাতির পদস্খলনে কিছু দোষ হয়, তৎপক্ষে আমরা দরিদ্র গোল্ডস্মিথের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিব যে "কথন পতিত না হওয়া মানবের পক্ষে তত গৌরবের বিষয় নহে, কিন্তু যতবার পতিত হইবে ততবার সমুত্থান করাতেই তাহার গৌরব।"

এই বচনে যে সারতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাই মানব-প্রকৃতি-সঙ্গত ও মানবীয় ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম কহে—"মানব, তুমি একেবারে নিষ্পাপী হও" সে ধর্ম্ম মানবের জন্য নহে। তাহা মনুষ্য অপেক্ষা কোন উচ্চতর প্রাণীর উপযোগী হইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। যেহেতু, সে ধর্ম্ম মানব কখন পালন করিতে সমর্থ হইবে না। মানব-প্রকৃতি কখন একেবারে নিষ্পাপী হইবার নহে। মানব সহস্রবার পাপে পতিত হয়, সহস্র-বার পাপ হইতে উত্থিত হয়। যে না উঠিতে পারে তাহারই অধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই প্রকার ভাব জানিয়া শুনিয়াও আমরা অবলা স্ত্রীজাতির প্রতি বড় কঠিনতর নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহাদিগকে আমরা একেবারে নিষ্পাপী ও নিষ্কলঙ্ক চাই। কি বিষয়ে?—সতীত্ব বিষয়ে। তবে আমরা সতীত্ব কাহাকে বলি তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে।

আমরা সতীত্ব ধর্ম্মের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া স্ত্রীজাতীয়

স্বাধীনতার কথার অবতারণ করিয়াছি। কারণ, বুদ্ধিশীল প্রাণী মাত্রেরই ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে তাহার কতদূর স্বাধীনতা আছে, তাহা অগত্যা বিচার্য্য হইয়া পড়ে; যেহেতু, স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব নহিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্ভাবিত হইতে পারে না। আমাদিগের বামাগণের এবম্প্রকার কর্ত্তৃত্ব আছে কি না, তাহাই বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত। এই নিমিত্ত এই বিষয়ে আমরা বামাজাতির স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছি। অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিতে হইলেও সাধারণতঃ স্ত্রীস্বাধীনতা হইতে কোন প্রকার সামাজিক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই, ইহাও আমাদিগের সংস্কার। আমরা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রদান করা?—কে প্রদান করিবে? আমরা কি প্রদান বা গ্রহণ করিবার কর্ত্তা? তবে যে আমরা তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছি, তাহা কেবল বলে ও কৌশলে। স্বাধীনতা বুদ্ধিজীবী প্রাণী মাত্রেরই স্বাভাবিক ভাব ও সম্পত্তি। রুশো বলিয়াছেন, মানব স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তিনি একথা প্রতিপন্নও করিয়াছেন। তবে যে প্রকৃতির অযথা প্রবলতা ও প্রতাপ সুশাসন করা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু প্রকৃতিকে সুশাসনে রাখিতে হইলে, তাহাকে যে একেবারে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। প্রকৃতির সুশাসন ও বিনাশন এ দুই স্বতন্ত্র কথা। প্রকৃতির সুশাসন স্বাভাবিক, প্রকৃতির

বিনাশন অস্বাভাবিক। স্বাধীনতা-সমুৎপন্ন যথেচ্ছাচারিতার সুশাসন করা স্বাভাবিক, স্বাধীনতার বিনাশন অধীনতা—অস্বাভাবিক। যাবতীয় স্বাধীন প্রাণী যে সর্ব্বদা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, অথবা তাহা সুশাসনে রাখিবে ইহা সম্ভাবিত নহে বটে, কিন্তু তা বলিয়া অপর কাহারও যে তাহা অপহরণ করার অধিকার আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সে যাহা হউক, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার প্রস্তাব আন্দোলন করিতে হইলে যে একখানি বৃহৎ গ্রন্থেও তাহার সমাপ্তি হয় না তাহা বলা অনাবশ্যক। এই স্বাধীনতার বিপক্ষে সমগ্র পুরুষজাতি বৈর সাধন করিতেছেন। ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত না হইতে হইতে অমনি সমগ্র পুরুষজাতি উচ্চরবে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। কতই গুরুতর ও সামান্য পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিতে থাকেন। কিন্তু দেখিতে গেলে, কোন আপত্তিরই সারবত্তা নাই; সকল আপত্তিরই মূলে স্বার্থপরতাকে প্রচ্ছন্ন দেখা যায়। আজি পর্য্যন্ত কতশত পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যে কতশত কূটপক্ষ উত্থাপিত হইবে তাহারও গণনা নাই। এই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করা একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব বলিয়া আমরা তাহা হইতে এক্ষণে বিরত হইলাম। উপস্থিত বিষয় বিচার করা এক্ষণে আবশ্যক হইতেছে।

আমরা সচরাচর সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি নারীগণকে সতীত্ব ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কি কি গুণে তাঁহারা সেই মহৎ নামের অধি-

কারিণী হইয়াছেন তাহার আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে, আমাদিগের সতীত্বের ভাব কি প্রকার। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ইহারা সকলেই পরম পতি-পরায়ণা ছিলেন। অতএব পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম যে সতীত্ব ধর্ম্মের অন্তর অঙ্গ, তাহার আর সংশয় নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদিগের পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের ভাব কি প্রকার।

পরিণয় সংস্কারে আবদ্ধ হইলে, স্বামীর প্রতি কলত্রের যে প্রকার অনুরাগ হওয়া উচিত এবং তজ্জনিত যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য বিধেয় হয়, আমাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তদপেক্ষা অধিকতর অনুরাগ ও অযথা কর্ত্তব্যসাধনের আবশ্যক। আমাদিগের শাস্ত্রে কহে পতিই, পত্নীর পার্থিব দেবতা। অতি শৈশবকাল হইতে আমাদিগের বামাগণ এই পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শুধু দীক্ষিত নন, পিত্রালয়ে বালিকাবস্থা হইতে মাতৃ-দৃষ্টান্তে ইহার আদর্শ দেখিতে থাকেন। সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বজনের মুখেই এই ধর্ম্মের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। প্রতিবেশিনীগণও ইহাই শিক্ষা দেন। তাঁহারা শিক্ষা দেন ঃ—তাঁহাদিগের স্বামীর কতদূর প্রভুত্ব; সেই স্বামীর অনুরাগভাগিনী হইবার জন্য, তাঁহারা কতই যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করেন, এবং কত কষ্ট স্বীকার করিয়াও হয়ত কেহ কেহ কৃতার্থ হইতে পারেন না। তাঁহারা শিক্ষা দেন, পতিই সকলের একমাত্র গতি। যখন কোন শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই, যখন কোন মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়

নাই, যখন সমুদায় জ্ঞান সংস্কারমাত্র, যখন সংস্কার সকল সঞ্জাত না হইতে হইতে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, কিছুই বিচারস্থানীয় হয় না,—সেই জ্ঞানবিরহিত শৈশব-কাল হইতে বালিকারা অহরহঃ পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে থাকে। দেখে পতি-বিরহে কত অবলার যন্ত্রণার আর ইয়ত্তা নাই। তৎসঙ্গে শিক্ষা পায়, পতি কামিনীকুলের কি অমূল্য ধন ; পত্নীর জীবন বিনিময়েও সে ধনের মূল্য হয় না। দেখে কত বিরহ-বিধুরা পত্নী শোকাতুরা হইয়া দিনযামিনী অশ্রু বিমোচন করিতেছে। দেখে, পতি নিতান্ত নিষ্কর্ম্ম হইলেও পত্নী নিরতিশয় যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত আছেন এবং দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছেন, কি প্রকারে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিবেন। পতি আতুর ও অক্ষম, মূর্খ ও কোপনস্বভাব, নির্ব্বোধ ও পানাসক্ত, এবং পরম দুর্ব্বৃত্ত হউন, বালিকা দেখে, তথাপি সেই পতি গৃহে আসিলে স্ত্রীর নিকট তাঁহার সমাদরের পরিসীমা নাই। পতি হাসিলে পত্নীকে হাসিতে হইবে ; কাঁদিলে, কাঁদিতে হইবে। পত্নীর প্রতি পতি যে প্রকার বাক্য প্রয়োগ করুন না কেন, পত্নীকে অতি সাবধানে এরূপ উত্তর দিতে হইবে, যেন কোন মতে আর্য্যপুত্রের অসন্তোষ না জন্মায়। পতি কখন কি আদেশ করেন, পত্নীকে তজ্জন্য সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পতির অনুগামিনী হইয়া সেই আদেশ বহন করিতে হইবে। পতি যদি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন অথবা প্রহার

করেন, নিরীহ মেষের ন্যায় পত্নীকে তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। পতির প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা অথবা কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করা পত্নীর পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় ও গুরুতর পাতক। পতিপরায়ণতার এই প্রকার দৃষ্টান্ত বালিকা চারিদিকেই দেখিতে থাকেন। নিরক্ষরা বালিকা সেই তরুণ বয়সে আর কিছুরই শিক্ষা পান না। তাহার হৃদয়ে পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম যেমন বদ্ধমূল হইয়া যায় এমত আর কিছুই নহে। আশৈশব তাহার এই সংস্কার জন্মায় যে, পতিই স্ত্রীর সর্ব্বস্বধন, সে ধন বিরহিত হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, সে ধন লাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া অনাবশ্যক নহে।

বালিকার এই সংস্কার এতদূর বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, ইহা ক্রমশঃ রিপুর আকারে পরিণত হয়। বাস্তবিক পতির প্রতি অনুরাগ, বঙ্গবামার হৃদয়ে এক প্রকার অন্ধ রিপুবৎ কার্য্য করে। এই অন্ধ রিপুর বশবর্ত্তিনী হইয়া সাবিত্রী মৃতপতির অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। নহিলে কিছুদিনের মধ্যে সত্যবানের প্রতি সাবিত্রীর তত প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। সীতাকে বরং একদা প্রণয়ানুরোধে পতি সঙ্গে বনগামিনী হইতে দেখিলে আমরা তাহা সম্ভাবিত জ্ঞান করি, কিন্তু সত্যবানের প্রতি সাবিত্রীর অনুরাগ কখন সম্ভাবিত বোধ হয় না। অতএব সাবিত্রীর পতিপরায়ণতাকে আমরা একটী অন্ধ রিপুর কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতে

পারি না। সে পতিপরায়ণতার মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহার কতদূর ধর্ম্মনৈতিক গৌরব আছে, তাহা ঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন। আমাদিগের অনুমান এই, এবম্বিধ পতিপরায়ণতার শিক্ষা দিবার জন্যই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাবিত্রীর উপকথার সৃষ্টি করিয়াছেন।

এক দিকে ভার্য্যা এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া যেমন পতির নিতান্ত আনুগত্য প্রকাশ করেন, পতিও তেমনি আপনাকে ভার্য্যার সম্পূর্ণ প্রভু জানিয়া তাহার উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। আমাদিগের এমনি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা যে, স্ত্রীকে যত অবজ্ঞা করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামীর কথা ভার্য্যাকে অবশ্য শুনিতে ও মানিতে হইবে। স্বামী দুশ্চরিত্র হইলেও স্ত্রীর কথা শুনিবেন না, পত্নী তাঁহার অসৎ পরামর্শের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য,—স্বামীর মনে এতদূর প্রভুত্বের ভাব থাকা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রভুত্বের ভাব এতদূর প্রবল যে, গৃহে প্রবেশ মাত্র তাঁহার মনে সেই ভাবজনিত দম্ভ উপস্থিত হয়। তখন বোধ হয় তিনি যেন একটী বিশাল রাজ্যের রাজা, অমনি তাঁহার মেজাজ রুক্ষ হয়, ভাষা কর্কশ ও স্বর গম্ভীর হইয়া উঠে। তাঁহার বাহিরের ভাব গৃহে আসিয়া সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। স্ত্রীর প্রতি পতি হাজার নিষ্ঠুরাচরণ করুন, কেহ দূষিবে না; কিন্তু সাধু ব্যবহার করিলে অনেকে স্ত্রৈণ বলিয়া নিন্দা ও উপহাস করিবে। পরস্পরের এইরূপ মনের ভাব যে

কত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা অনেকে জানেন না। জানিলেও পুরুষজাতি প্রভুত্ব ছাড়িতে রাজি নহেন। যাহার কোন খানে প্রভুত্ব নাই, গৃহে আসিয়া ক্ষণকালের জন্যও তিনি প্রভু হইয়া মনের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করেন, ও মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন। এমন বিনা মূল্যের একাধিপত্য কে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে?

স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের এই প্রকার অসমুচিত ব্যবহার সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখা যায়। স্ত্রীজাতি আমাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ও নিতান্ত অধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই প্রকার অধীনতা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সামাজিক অবস্থাগতিকে আমাদিগের বামাগণ যে অধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে, যে অনুরাগ বাহিরে দেখাইতে থাকে, প্রভুত্ব-গর্ব্বান্ধ পুরুষজাতি তাহাই পরম পরিশুদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন. কিন্তু আমাদিগের বামাগণকে পতিব্রতা বলিবার অগ্রে বিবেচনা করা উচিত, তাহাদিগের সেই পতিপরায়ণতা কতদূর বিশুদ্ধ, কতদূর সামাজিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল, কতদূর প্রকৃত প্রেমানুরাগের পরিচয়।

লোকে বলে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, তাহারা স্বাধীনভাবে চলিতে সমর্থা নহে। তাহারা বাহিরে কিছু দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমরা যত দুর্ব্বলা বলি, তাহারা স্বভাবতঃ যে তত দুর্ব্বলা নয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অনেক পরিমাণে আমরা তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়াছি,

অভ্যাস ও অজ্ঞতা তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়াছে, দেশের আচার ব্যবহার তাহাদিগকে দুর্ব্বলা ও অবৈধ পরিমাণে পরাধীন করিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীজাতি যেরূপ দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের উপর তাহাদিগের নির্ভর করা সমুচিত বটে, কিন্তু তা বলিয়া কি পশ্বাদির ন্যায় তাহাদিগকে আমাদিগের সেবায় নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য? আমরা কি নীচ, যে দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করি! আমরা কি মনে করিয়াছি, আমাদিগের এই নীচভাব চিরকাল সুরক্ষিত থাকিবে? পৃথিবীতে কি সাধুভাবের উদয় হইবে না? সংসাররূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া আমরা স্ত্রীজাতির উপর নিপীড়ন করিব, ইহা কোন্ ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে? স্ত্রীজাতিকে আমরা অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছি। তাহাদিগের বিষয়বিজ্ঞতা ও পার্থিববিজ্ঞতা জন্মাইবার শক্তি আমরা হরণ করিয়াছি। সাংসারিক কোন কার্য্যে তাহারা একটু অসাবধান হইল, কোন অপকর্ম্ম করিল, আমাদিগের একটী আদেশ শুনিতে বিলম্ব করিল, অমনি আমরা খড়্গহস্ত হই। এইরূপে আমরা তাহাদিগের ভীরুতা প্রবল করিয়া দিয়াছি, এবং সেই ভীরুতার সুবিধা লইয়া থাকি। আমাদিগের প্রতি তাহাদিগের কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, বলিলে তৎক্ষণাৎ তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয়, সুতরাং নিরুপায় স্ত্রীজাতি বশীভূত না থাকিয়া কি করিবে?

মানুষ, সামাজিক অবস্থার দাস। তাহাতে আবার

আমাদিগের অবলাগণের কোন শক্তি নাই। নিরক্ষরা ও বিবেচনাহীনা হইয়া তাহারা আপনাদিগের অবস্থাও সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না। যখন নিতান্ত নিপীড়িত হয়, যখন নির্দ্দয় পুরুষজাতির কঠোর ব্যবহারে দেহ জর্জ্জরিত হয়, তখন একবার শিরে করাঘাত করিয়া আপনাদিগকে হতভাগিনী বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। কিন্তু তাহাদিগের সেই আর্ত্তনাদ পর্য্যন্তই সকলি শেষ। তাহার অতীত আর কোন উপায় নাই। তাহাদিগের এমত জ্ঞান নাই যে, পতিবশবর্ত্তিতার সীমা কোথায়, এবং স্ত্রীকর্ত্তব্যের সহিত দাসীত্বের প্রভেদ কোথায়, তাহা বিচার করিয়া লয়। পতি তাহাদিগকে যত দূর অধীনে আনিতে চান, তাহারা ততদূর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। শৈশবলব্ধ পাতিব্রত্যধর্ম্মীয় সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহারা স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞানে পূজা করে, পতির সহস্র দোষসত্ত্বেও তাহাদিগের দেবভক্তি অপনীত হইবার নহে। যে ব্রতে স্বামীর পূজা আদিষ্ট আছে, সেই ব্রতই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গ্রহণ করে, এবং সর্ব্ববিধায়ে স্বামীর সম্পূর্ণ দাসী হইয়া মনুষ্যপূজার একশেষ প্রকাশ করিতে থাকে।

যে পাতিব্রত্যধর্ম্মে এই প্রকার মনুষ্যপূজা নিয়োজিত আছে, সেই পাতিব্রত্য কতদূর ধর্ম্মসঙ্গত তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীজাতির কি গভীর জ্ঞানান্ধতা! তাহারা জানে না যে, যাহাকে তাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে,

তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, তাহা ঘোর অধর্ম্ম, তাহা মনুষ্যপূজা।

আমাদিগের বামাগণের পাতিব্রত্যধর্ম্মের প্রকৃতি কি, তাহা আমরা বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি, এইধর্ম্ম কতদূর কর্ত্তব্যজ্ঞানে শাসিত ও নিয়মিত হয়, এবং পতির প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরাগ ও পতির পূজা কেমন বামাগণের সামাজিক অবস্থার ফল। আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, এই ধর্ম্ম তাহাদিগের কোমল হৃদয়ে যেন রিপুবৎ কার্য্য করে। তাহারা স্বেচ্ছামত পুরুষজাতির নিতান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা অবস্থাগতিকে কেমন অধীনতায় বিনত হইয়াছে। দেশের আচারব্যবহারের বশবর্ত্তিতা, আশৈশব অভ্যাস, সামাজিক দৃষ্টান্ত ও মূঢ়তার প্রভাব তাহাদিগের ইচ্ছাকে এতদূর বিনত করিয়াছে যে, তাহাদিগের সেই দাসীত্ব যেন স্বাভাবিক ও পশুসংস্কারবৎ হইয়া পড়িয়াছে। সেই দাসীত্বে বুদ্ধিশীল ও স্বাধীনপ্রাণীর স্বাভিপ্রেত বশবর্ত্তিতা, অথবা নির্ভর-ভাবের কিছুই নাই। তাহাতে যেন জড়পদার্থের নমনীয়তা প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগের পতিপরায়ণতা ও পতির প্রতি অনুরাগ স্থির কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতে সমুত্থিত হইতে পারে না। পূর্ব্বে প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক করিয়া ইহা তাহাতে পশু-সংস্কারবৎ বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ইহা তাহাদিগের হৃদয়ে পশু-সংস্কারবৎ স্বতঃই সমুদিত হয়। ইহা পশুর অনুরাগ,

জড়হৃদয়ের অনুরাগ। ইহা স্বাধীনভাবে উত্থিত হয় না। ইহা অবস্থাগতিকে নিয়োজিত হয়। ইহা নদীর স্বাভাবিক স্রোত নহে, ইহা বাত্যাতাড়িত তরঙ্গ। ইহাতে স্বাধীন ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সম্পর্ক নাই। স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের কার্য্যবিরহিত হওয়াতে ইহার কতদূর ধর্ম্মনৈতিক মূল্য, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে।

সীতা এবং সাবিত্রীর চরিত্রে আমরা যে কেবল পাতিব্রত্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই এমত নহে। তাঁহারা আরও শিক্ষা দেন, সতী নামের যোগ্যা হইতে হইলে, একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য পুরুষসংসর্গ পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সতীত্ব ধর্ম্মের ইহাই সুপ্রধান ও প্রথম লক্ষণ। এ গুণ যাঁহার নাই, অন্য সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি সতী বলিয়া গণনীয় হন না। একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ করা এতদ্দেশে ব্যভিচার বলিয়া অভিহিত হয়। এই ব্যভিচার দোষ পরিবর্জ্জন করাই সতীত্বধর্ম্ম। লোকসমাজে ইহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে কতদূর ধর্ম্মভাব বিদ্যমান আছে, তাহা একবার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি, এই পরীক্ষায় আমাদিগের অভিপ্রায় সাধারণ জনগণের চিরপোষিত বদ্ধমূল সংস্কারের বিরোধী হইবে, এবং তজ্জন্য আমরা হয় ত তাঁহাদিগের বীতরাগের ভাজন হইব; কিন্তু তা বলিয়া কি করিব? আমরা যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহার অপলাপ করা আমাদিগের কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না।

সীতাদেবী যে সতীত্ব ধর্ম্মের আদর্শ দেন, সাবিত্রী-প্রদত্ত আদর্শ হইতে তাহা বিভিন্ন। পতির সহিত সীতাদেবী বহুকাল সহবাস করিয়াছিলেন। রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র বহুগুণাধার ছিলেন বলিয়া সীতাদেবীর নিতান্ত মনোহরণ করিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। এমত স্থলে সীতাদেবীর মন স্বভাবতঃ রামচন্দ্রের দিকেই আকৃষ্ট ও রাবণের দিকে বীতরাগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সাবিত্রীর দৃষ্টান্তে এরূপ ঘটে নাই। সাবিত্রী বড় পতিসংসর্গ করেন নাই। সত্যবানের গুণেও সাবিত্রীর বশীভূত হইবার কারণ ছিল না। সাবিত্রীর হৃদয়ে পতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও প্রণয় জন্মিবার কোন কারণ ছিল না। সত্যবান্ আবার জীবিত ছিলেন না। তথাপি সত্যবানের জন্য সাবিত্রীকে লালায়িত হইতে হইয়াছিল। তথাপি সত্যবান্ ভিন্ন আর কেহই তাঁহার প্রণয়ভাজন হইবার যো নাই। আমাদিগের অনেক বালিকা-বিধবা কখন পতিসংসর্গ করে নাই। প্রণয় কিরূপ তাহারা হয় ত তাহার আস্বাদও প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ তাহাদিগকে চিরদিন সতী থাকিতে হইবে এবং যাহাকে স্বপ্নেও মনে পড়ে না, সেই পতির জন্য চিরজীবন শোকার্ত্ত হইয়া থাকিতে হইবে। প্রকৃতি যাহা করিতে সম্মত নহে, তাহা তাহাদিগের অবশ্য করিতে হইবে। প্রকৃতি যদি না কাঁদে, অবশ্য কাঁদাইতে হইবে। প্রকৃতি যদি পুরুষসংসর্গ ব্যতীত না থাকিতে পারে, তাহাকে রুগ্ন

করাও শ্রেয়, তথাপি অন্য পতি গ্রহণ করা শ্রেয় নহে। অন্য পতি গ্রহণ করা, আর ব্যভিচারিণী হওয়া, সমান কথা। সাবিত্রীর চরিত্রে এই সতীত্বের আদর্শ। সাবিত্রীকে বরং কবি বহুকালের পর সত্যবানের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়া তদীয় সতীত্ব ধর্ম্ম প্রকৃতি-সঙ্গত ও সুরক্ষিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গীয় বালিকা বিধবার সে আশাও নাই। তাহাকে আজীবন পুরুষ সংসর্গ-বিরহিতা হইয়া সতী নাম ক্রয় করিতে হইবে। অতএব পতি জীবিত থাকিতে যেমন অন্য-পুরুষ-সংসর্গ পরিবর্জ্জন করা আবশ্যক, সংসর্গের পূর্ব্বে স্বামী সুসংস্থিত হইলেও তদ্রূপ পবিত্র থাকা সতীত্ব ধর্ম্মের লক্ষণ। আবার শকুন্তলার দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, যে পুরুষের সহিত একবার সংসর্গ হয়, তিনিই রমণীর পতি এবং সেই পতি স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করুন আর নাই করুন, অন্যকে পতিত্বে বরণ করা নিষিদ্ধ, এবং অন্য পুরুষের সংসর্গ পরিহার করা নিতান্ত আবশ্যক। চিরদিন কেন জীবিত পতির সহিত বিচ্ছেদ ঘটুক না, চিরদিন কেন তৎসহবাস হইতে বিরহিত থাকুক না, তথাপি অপরপুরুষ বঙ্গবামার গ্রহণীয় নহে। অপর পুরুষের সহিত প্রণয় করা, অথবা পুনরায় পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়া, সামাজিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। এই প্রকার সতীত্বধর্ম্ম কতদূর মানব-প্রকৃতি-সঙ্গত তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। এবম্প্রকার ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহা অনায়াসেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে

আমাদিগের সহযোগী, "বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত" নামক গ্রন্থের সুবিজ্ঞ সমালোচক, যোগেন্দ্র বাবু, উক্ত সতীত্বধর্ম্মের পাপময় ফলাফল প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, তাহাকে অবশ্য অধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। অথচ বঙ্গবামাকে এই ধর্ম্মের বশবর্ত্তিনী থাকিতে হইবে; এবং বাস্তবিক যাহা অধর্ম্ম তাহা ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুবর্ত্তনে ধর্ম্মশীলা বলিয়া তাঁহাকে খ্যাতিলাভ করিতে হইবে। নহিলে জন-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিবে না। আহা! বঙ্গবামার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা কি ভয়ঙ্কর, কি শোচনীয়! কত দিনে তিনি এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইবেন, কে বলিতে পারে?

বামাগণের পক্ষে সতীত্বধর্ম্মের নিয়ম এত কঠিন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় সমাজে পুরুষ-জাতির পক্ষে সেই একই নিয়ম কেমন শিথিল। এক ধর্ম্ম বিভিন্ন জাতির প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহার যে এত বৈপরীত্য ঘটে, এ বড় বিচিত্র কথা। জাতিবিশেষে একই ধর্ম্মের নিয়ম যে বহুবিধ হইবে, ইহা ধর্ম্মের প্রকৃতি-গত নহে। যাহা ধর্ম্ম, তাহার বিপরীত অবশ্য অধর্ম্ম। শ্বেত কখন কৃষ্ণ হইতে পারে না, কৃষ্ণ কখন শ্বেত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে তাহা সঙ্গত। পুরুষের পক্ষে যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মানুমত, স্ত্রীর পক্ষে তাহা ঘোর অধর্ম্ম। স্ত্রীজাতির মধ্যে একাধিক বিবাহ অসিদ্ধ, অথচ পুরুষের মধ্যে তাহা বিলক্ষণ প্রচলিত

আছে। বহুবিবাহ যদি পুরুষের পক্ষে ধর্ম্মবৈধ হয়, স্ত্রীজাতির পক্ষে তাহার বিপরীত হইবে কেন, আমরা স্থূলবুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আবার আমাদিগের বিবাহসংস্কারের ধর্ম্মবন্ধন পর্য্যালোচনা করিলে অধিকতর আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক বিবাহে বরকন্যা উভয়েই ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। স্ত্রীকে চিরজীবনের জন্য সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। স্ত্রী আর দ্বিতীয় পুরুষের পাণিগ্রহণে ধর্ম্মতঃ সমর্থা নহে। কিন্তু পুরুষ-জাতি আবার অন্য রমণীর পাণিপীড়নে ধর্ম্মতঃ সমর্থ। স্বামী, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে প্রথম পরিণয়ের সমুদায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয়েন; স্ত্রীকে পরিত্যক্তা করিয়াও রাখিতে পারেন, তাহাকে যথেচ্ছা হতাদর করিতে পারেন। স্ত্রী কিন্তু সেরূপ করিতে পারেন না। স্বামী অনায়াসে সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ভার্য্যার সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। স্বামী অনায়াসে প্রথম পরিণয়ের সমুদায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে এ নিয়ম শাস্ত্রসঙ্গত নহে। স্ত্রীকে পরিণয়ের সমুদায় প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। একজনের পক্ষে যে বিবাহের বন্ধন অলঙ্ঘনীয় এবং যে প্রতিজ্ঞা পালনীয় অন্য জনের পক্ষে তাহা নহে। পতির সম্বন্ধে বিবাহের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে, কিন্তু স্ত্রীর সম্বন্ধে নহে। যে বিবাহের এই প্রকার শিথিল ধর্ম্ম-নৈতিক বন্ধন, তাহাকে কি বাস্তবিক বিবাহ বলা যায়।

যে বিবাহ এক পক্ষে পক্ষপাতী, যে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম দুজনের মধ্যে অন্যতরের পক্ষে কেবল প্রযুক্ত হইবে, সে বিবাহ এবং সে প্রতিজ্ঞায় কতদূর ধর্ম্মবল, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। যে ধর্ম্মসংস্কার একপক্ষে ভঙ্গপ্রবণ, তাহা অন্য পক্ষে কেন সুদৃঢ়-বন্ধন হইবে, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু পক্ষপাতী পুরুষের নিকট সকলি সম্ভব, ধর্ম্মের নিকট নহে। ধর্ম্ম কহিবে যে, যাহা ধর্ম্মতঃ ভঙ্গপ্রবণ তাহা কখন আবার ধর্ম্মতঃ দৃঢ়বন্ধন হইতে পারে না। অতএব পুরুষের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলেও আমাদিগের বিবাহ-পদ্ধতির কিছুই ধর্ম্মবন্ধন উপলব্ধ হয় না। কারণ যাহা ধর্ম্মতঃ শিথিল, তাহা ধর্ম্মতঃ অচ্ছেদ্য হইতে পারে না। যে বিবাহের কিছু ধর্ম্মনৈতিক বন্ধন নাই সে বিবাহকে কোনমতে ধর্ম্ম-বিবাহ বলা যাইতে পারে না, এবং তাহাতে দম্পতীর অন্যতর কেহই ধর্ম্মতঃ আবদ্ধ নহে। কিন্তু হায়! এই বিবাহের উপর স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম স্থাপিত রহিয়াছে। যিনি ধর্ম্মতঃ স্ত্রীর পতি নহেন, তাঁহাকে অবশ্য তাঁহার পতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই হাস্যকর বিবাহের যাবতীয় প্রতিজ্ঞা কেবল তাহার পক্ষে চিরজীবন পালনীয়। যে বিবাহ প্রকৃত বিবাহ নহে, সেই বিবাহ-নির্দ্দিষ্ট একজন পতি হইল, এবং সেই পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ পরিবর্জ্জন করা আবার সতীত্বধর্ম্ম হইল! আশ্চর্য্য আমাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান, আশ্চর্য্য আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ড, আশ্চর্য্য আমাদিগের ব্যবস্থা, বিবাহ, সতীত্বধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার।

পুরুষের পক্ষ হইতে বিচার করিয়া আমাদিগের পরিণয়সংস্কারের কতদূর ধর্ম্মনৈতিক বন্ধন, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, স্ত্রীপক্ষ হইতে দেখিলেও বালিকাবিবাহের কিছু ধর্ম্ম নৈতিক বন্ধন উপলব্ধ হয় না। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় পক্ষ হইতে বিচার করিয়া যে উদ্বাহ কার্য্যের ধর্ম্ম-বৈধতা প্রতীত হয় না, সেই উদ্বাহ-সংস্কারে কেবল অবলাগণকে অতি দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিচার করিতে গেলে প্রতিপন্ন হয় যে, কি স্বপক্ষ, কি স্বামীপক্ষ, কোন পক্ষের বিচারে আমাদিগের বামাগণের প্রকৃত বিবাহ হয় না। শাস্ত্রপক্ষীয়গণ যদি এই কূট তর্ক উত্থাপিত করেন যে, পুরুষে তৃতীয় বা চতুর্থবার বিবাহ করিলেও তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় বারের বিবাহ-বন্ধন খণ্ডিত হয় না, তদ্বিরুদ্ধে আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, তাহা আশ্চর্য্যরূপে বৈধ করা হইয়াছে। তাহা কেবল বিধানে বৈধ, ধর্ম্মতঃ এবং যুক্তিতে নহে। পুরুষ জাতির হাতে শাস্ত্র এবং পুরুষ জাতিই প্রবল; সুতরাং পুরুষজাতি আপনাদিগের সুবিধার্থ যাহা ইচ্ছা, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কে তাহার যুক্তি এবং ধর্ম্ম-নৈতিক মূল বিচার করিয়া দেখিবে? স্ত্রীজাতির জ্ঞান-ধ্বনি যদি কোন কালে প্রবল হয় তখন সে তর্ক উঠিবার কথা। ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চ বিচারে যখন এই সমস্ত পক্ষপাতী ব্যবস্থার নৈতিক মূল আলোচিত হইবে, তখন ইহাদিগের সিকতাময় ভিত্তিমূল অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। কত

দিনে সেই শুভদিনের উদয় হইবে, এই আমাদিগের আশা, এই আমাদিগের হৃদয়ের একান্ত বাসনা।

কিন্তু মনে করুন, আমাদিগের বিবাহ ধর্ম্মতঃ বৈধ, এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেহই তাহার ধর্ম্মবন্ধন ছেদন করিলেন না। স্ত্রী যেমন পতির প্রতি, পতিও তেমনি এক মাত্র স্ত্রীর প্রতি চিরদিনের জন্য অনুরক্ত রহিলেন। প্রচলিত বিবাহরূপ কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দুই বিভিন্ন-রুচি ও প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির চিরজীবনের জন্য একত্রসহবাস ও মিলন স্বাভাবিক, কি অস্বাভাবিক, মানবের প্রকৃতি-সঙ্গত, কি অসঙ্গত, তাহা আমাদিগের বিচার্য্য নহে *। এক্ষণে বিচার্য্য এই, আমাদিগের গৃহ লক্ষ্মীদিগের যে সতীত্ব ধর্ম্মের আমরা এত অহঙ্কার করি, তাহার ধর্ম্মনৈতিক গৌরব কতদূর। কোন কার্য্যের ধর্ম্মনৈতিক গৌরব পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই ধর্ম্ম-কার্য্য সাধন-পক্ষে অনুষ্ঠাতার কতদূর স্বাধীনকর্তৃত্ব আছে, অথবা কি অবস্থায় তাহা সম্পাদিত হইতেছে। অতএব, পতি ভিন্ন পরপুরুষের সংসর্গ পরিহার করাকে যখন আমরা সতীত্ব ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করি, তখন সেই ধর্ম্ম পরীক্ষার সময় দেখিতে হইবে, প্রথমতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে পরপুরুষের সহিত সংসর্গ ঘটিবার কতদূর অবসর ও সুযোগ আছে; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্ত অবসর ও সুযোগ পাইলে আন্তরিক ধর্ম্মবল দ্বারা প্রলোভনকে প্রতিরোধ করিয়া কুপ্রবৃত্তির উপর সুপ্রবৃত্তির প্রভুত্ব

---

* See "The Elements of Social Science" on Marriage.

স্থাপন করা কতদূর সাধ্য। এই নিকষে যদি তাহাদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের নির্ম্মলতা প্রতিপাদিত হয়, তবে আমরা সে ধর্ম্মের গৌরব করিতে পারি; নহিলে আমরা বলিব, আপনাদিগের সন্তৃপ্তির জন্য, স্ত্রীজাতিকে আমরা ধরিয়া ও বান্ধিয়া সতী করিয়াছি, এবং এইরূপে সতী করিয়া পরের নিকট অহঙ্কার করি, আমাদিগের স্ত্রীজাতির মত সতী আর পৃথিবীতে নাই।

প্রথমতঃ। আমাদিগের বামাগণের পক্ষে পতি ভিন্ন পরপুরুষের সহিত সংসর্গ ঘটিবার অবসর ও সুযোগ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। সামাজিক স্বাধীনতা না হইলে সেরূপ ঘটিবার অল্পই সম্ভাবনা। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আমাদিগের পুরুষজাতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কতদূর সাবধানতা সহকারে বামাগণকে অন্তঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহারা আপনাদিগের সন্তৃপ্তির জন্য এইমাত্র চান, যেন কোন মতে কুলকামিনীগণ অপর পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, এবং তাহার অসৎ-প্রলোভনে না পড়ে। তাঁহারা আন্তরিক সতীত্বের প্রতি তত দৃষ্টি করেন না, দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা হইলেই যথেষ্ঠ জ্ঞান করেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, আমাদিগের রমণীকুল অন্তঃপুর হইতে একবার বহির্গত হইলে অমনি অপবিত্র হইয়া যাইবে। তাঁহারা বিধবাগণের প্রতি অহরহঃ নেত্র উন্মীলিত করিয়া আছেন। অতি সন্তর্পণে বিধবা-কুলকামিনীগণকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। আপনাদিগের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণও যদি পুরস্ত্রীগণের

কুশলবার্ত্তা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহাও আমাদিগের পুরুষজাতির পক্ষে অসহ্য জ্ঞান হয়। বাহিরে পুরাঙ্গনাগণের কোনপ্রকার রব শুনিতে তাঁহারা ভালবাসেন না। আমাদিগের বামাগণ পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন, সুতরাং তাহাদিগকে পুরুষজাতির সকল নিয়োগেরই বশবর্ত্তিনী হইতে হয়। সামাজিক আচার ব্যবহার অতিক্রম করিবার তাহাদিগের ক্ষমতা নাই। পুরুষজাতি যাহাকে সুশীলতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, বামাগণ সেই সুশীলতা লাভার্থ নিতান্ত যত্নবতী হয়। পুরুষজাতি যাহার উপর স্ত্রীজাতির মান ও মর্য্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন, রমণীকুল সুতরাং সেই ব্যবহারের অনুবর্ত্তিনী হইয়া মানমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল হয়। তাহাদিগের আন্তরিক ভাব কেন যাহাই হউক না, পুরুষজাতি তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন না। পুরুষজাতি নিশ্চয় জানেন, তাহাদিগের আন্তরিক ভাব বড় বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করেন না। কারণ, তাঁহারা মনে মনে বিলক্ষণ জানেন যে, অবসর ও সুযোগ বিরহিত বলিয়াই তাহাদিগের স্ত্রীজাতির দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা হইতেছে। বামাগণ যদি একবার সমাজে মিশিতে পায়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে? বাস্তবিক তখন আমরা দেখিতে পাইব, যাহাদিগের সতীত্ব লইয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া বেড়াই, তাহারা চারিদিকে যথেচ্ছাচারিতার একেবারে এক শেষ করিতেছে। অতএব স্বাধীনতারূপ নিকষে পরীক্ষা

করিলে, তাহাদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের গৌরব কখন রক্ষিত হইতে পারে না। তবে সে সতীত্বের ধর্ম্মনৈতিক মূল্য কি? ইহার ধর্ম্মদুর্ব্বলতা দেখিলে, আমরা ইহাকে কোঁন মতে প্রকৃত সতীত্ব ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। সতীত্ব ধর্ম্মের পরীক্ষাস্থল স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতায় পরিস্থাপিত হইয়া যে সতীত্ব পরীক্ষিত হয় নাই, তাহার ধর্ম্মনৈতিক বল কতদূর, তাহা আমরা কিছুই অবগত নহি। তাহার ধর্ম্মবল অবগত না হইয়া আমরা কি সাহসে তাহার গৌরব করিতে উদ্যত হই? যখন স্ত্রীজাতি স্বাধীন থাকিয়া সতীত্ব ধর্ম্মে ভূষিতা হইবেন, তখন আমরা একদা তাহাদিগের সতীত্বের গৌরব করিতে পারিব। পরাধীন শত সহস্র কুলাঙ্গনার সতীত্ব, এক জন স্বাধীন রমণীর সতীত্বের সহিত তুল্যমূল্য নহে। কারণ, এক জন স্বাধীন রমণীর সতীত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে। কারণ, এক জন স্বাধীন বামার সতীত্ব পর-বল-নিয়োজিত নহে। কারণ, স্বাধীন রমণী সামাজিক ধর্ম্মনৈতিক অবস্থায় পরিস্থাপিত হইয়া আপনার ধর্ম্ম সাধন করিতেছে। কিন্তু আমাদিগের রমণীকুল সামাজিক ধর্ম্মনৈতিক অবস্থায় স্থাপিত নহে। স্বাধীন অবস্থাই ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার নিদান, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহারা সেই স্বাধীনতা বিরহিত, তাহাদিগের কোন ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা সম্ভবে না। যাহাদিগের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা নাই, তাহাদিগের ধর্ম্মের মূল্যও কিছু নাই। যাহারা স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতে পারে নাই, তাহাদিগের কার্য্যের আবার গৌরব কি?

অতএব এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, আমাদিগের স্ত্রীজাতির সতীত্ব-ধর্ম্মের ধর্ম্মমূল্য কিছুই নাই। তাহাদিগের মধ্যে দুই দশ জনের ধর্ম্ম আন্তরিক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে ধর্ম্মের কতদূর বল, স্বাধীনতা ব্যতীত তাহার পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের বামাগণ যে প্রকার অধীনভাবে অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধা থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব কিছুই উপলব্ধ হয় না। তাঁহারা আপনারা সতী হন নাই, কিন্তু অবস্থা-গতিকে অসতী হইতে পারেন নাই। নিষ্ঠুর পুরুষজাতির প্রহার-ভয়ে তাহারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত বলিয়া তাহাদিগের বিশেষ অপ্রিয় কার্য্য করিতে সাহসিনী হইতে পারেন না। জানেন, সে কার্য্যে লিপ্ত হইলে, চিরজীবনের জন্য তাহাদিগের ইহকাল বিনষ্ট হইবে; সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত হইবেন, যৎপরোনাস্তি নিন্দিত হইবেন, প্রহারিত হইবেন, অন্নের জন্য লালায়িত হইবেন, এবং দুরবস্থার একশেষ হইয়া চিরদিন কাঙ্গালিনী হইয়া দিনযাপন করিতে হইবে। এই ভয়ে তাঁহারা গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকেন। অন্ন বস্ত্রের জন্য নিতান্ত লালায়িত হওয়া অপেক্ষা গৃহমধ্যে সকল যন্ত্রণা সহ্য করাকে তাঁহারা শ্রেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। সামাজিক ব্যবস্থা যদি এ প্রকার না হইত, তাহা হইলে আমরা সন্দেহ করি যে, আমাদিগের স্ত্রীজাতি এক্ষণকার মত নিষ্কলঙ্ক হইয়া আমাদিগের গৌরবের কারণ হইতে পারিত কি না?

দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের স্ত্রীজাতির আন্তরিক ধর্ম্মবল কতদূর তাহা পরীক্ষা করা উচিত। প্রথম বিষয়ের আলোচনায় অনেক দূর প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আমাদিগের বামাগণের আন্তরিক ধর্ম্মবল অত্যন্ত অল্পপরিমাণ। যে ভাগ্যবতী পুরস্ত্রীগণ চিরকাল পতির সহবাসে ও পতির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন, কেবল তদ্ব্যতীত দেখ, শত সহস্র পতিবিরহকাতরা কুলীন কন্যা, বৈধব্যদশাসম্পন্না কুলাঙ্গনা, অরক্ষিত বামাকুল, দূরবস্থ নারীগণ, বঙ্গদেশকে কি পাপস্রোতে প্লাবিত না করিতেছে? প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি যদি শ্রেয়স্কর হইত, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গদেশের বেশ্যাগণের সংখ্যা কোন দেশের সহিত সমতুল্য হইত না। বাস্তবিক, আমরা যে সমস্ত নারীর দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহাদিগের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, দুই এক জন স্ত্রীরত্ন অতি বীরত্বের সহিত সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বাজবাহাদুরের হিন্দুরাণীর বিষয় গ্রহণ করিলাম। তিনি বিষপানে দুর্বৃত্ত আদম খাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে সেই রাজ্ঞী কিরূপ অবস্থায় স্থাপিত হইয়া লম্পটের লালসা সম্পূর্ণ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়াছিলেন। যেখানে সময় ও অবস্থার বিশেষ না দেখা যায়, সেখানে দৃষ্ট হয় যে, বীরাঙ্গনার সতীত্ব ধর্ম্মবৃত্তি রিপুবৎ কার্য্য করিয়াছে। যাহা রিপুবৎ

কার্য্য করে, তাহার ধর্ম্মমূল্য অতি অল্প। তবে যে বীরাঙ্গনাগণের সতীত্ব ধর্ম্মভাব, স্বাধীন বামাগণের কর্ত্তব্য জ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। এত অল্প যে, তাহা সাধারণ নিয়মের নিপাতন-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে সমাজে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় কর্ত্তব্য-জ্ঞান দ্বারা বামাগণ যেরূপে আপনাদিগের সতীত্ব-ধর্ম্মভাবকে সুশাসনে নিয়মিত রাখিয়াছেন, সে প্রকার সতীত্বের অধিকতর ধর্ম্মনৈতিক মূল্য। সে সতীত্বের আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ, রিপু * অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞান † দ্বারা পরিচালিত হওয়া অধিকতর গৌরবের বিষয়। যিনি ইহা না বুঝেন, তিনি রিপু এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রকৃতি ও প্রভেদ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আর একপ্রকার আশ্চর্য্য সতীত্ব ধর্ম্মের আদর্শ নিম্নে বিবৃত হইল। ইহা আমাদিগের কোন শিক্ষিতা মহিলার রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "দুঃখের বিষয় এই, আমাদের হতভাগ্য দেশে যে পতি রাখিয়া মরিল, অথবা যে শ্বশুর ভাশুর ও অন্য পুরুষ সকলকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে, ভাল কি মন্দ কোন কথাই যাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে কেহ শুনে নাই, সেই পাড়ার ঠাকুরাণী, সোণাঠাকুরাণী, হরির পিসী, বামার মা, বিদ্যাসাগর, বাচস্পতি, বিদ্যাবাগীশদের নিকট, সতী

* Passion. † Principle.

উপাধি পাইয়া বসিল। যদি কোন বিদ্যাবতী ভগিনী সরলান্তঃকরণে ভ্রাতৃস্থানীয় পুরুষগণের সহিত একটু সদালাপে প্রবৃত্ত হন, তবে অমনি উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ চীৎকার করিয়া উঠেন—ছি ছি অমুকের বউটা কি নির্লজ্জ।" আমেরিকাবাসিগণ ক্রীতদাসের বশ্যতা অনুসারে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। আমাদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় দাসত্বে যাহারা অধিকতর কার্য্যকুশল হন তাহাদিগকে রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদিগের পুরুষ জাতিও তেমনি স্ত্রীজাতির জড়তা, নীরবতা, ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া যে তাহাদিগের সতীত্বের প্রশংসা ও গৌরব করিবেন এ বড় আশ্চর্য্য নহে।

আমরা জ্ঞান করি, স্বাধীন সমাজের স্ত্রীজাতি অধিকতর অসতী; ইহা আমাদিগের একটী কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারটী আমাদিগের বিবেচনার দোষের ফল। আমরা যে সমাজে অবস্থিত আছি, সে সমাজের কঠিনতর নিয়মাদিতে আমরা চির-অভ্যস্ত হইয়াছি। আমাদিগের জ্ঞান হয়, ইহার কথঞ্চিৎ অন্যথায় ব্যভিচারের ইয়ত্তা থাকিবে না। এই মনের ভাব আমরা স্বাধীন সমাজে অর্পণ করি। কিন্তু স্বাধীন সমাজের প্রকৃতি ও ভাব কিছুই অবগত নহি। সময়ে সময়ে দুই একটী ব্যভিচারের কথা শুনিয়া আমাদিগের কুসংস্কার আরও বদ্ধমূল হইতে থাকে। কারণ, অনুকূল দৃষ্টান্ত কুসংস্কারকে ক্রমশঃ বদ্ধমূল করিবেই করিবে। একবার কুসংস্কার

বদ্ধমূল হইলে, তাহা শীঘ্র অপনীত হইবার নহে। স্বাধীনতার প্রতি কার্য্যে, প্রতি শিষ্টাচারে, প্রতি রীতিতে আমরা কেবল যথেচ্ছাচারিতারই নিদর্শন দেখিতে থাকি। যে সমস্ত দৃশ্য আমাদিগের অভ্যাসের বহির্ভূত, তাহাতেই আমরা অপবিত্র ভাব আরোপিত করি। স্বাধীন সমাজে যে সমস্ত সামান্য কার্য্যে কিছুই অপবিত্র ভাব আরোপিত করে না, আমাদিগের অনভ্যাস নিবন্ধন, তাহাতে আমরা কুভাব আরোপিত না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহা আমাদিগেরই চক্ষের দোষ, মনের দোষ। স্বাধীন হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করাই প্রথমতঃ আমাদিগের পক্ষে অসহ্য ও পাপময় জ্ঞান হইয়াছে। সুতরাং তৎপরে সকল ঘটনাই দুর্নীতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা স্বাধীন সমাজের ধর্ম্মবল কিছুই অবগত নহি। সেখানে প্রণয় পরের বলকর্ত্তৃক আবদ্ধ নহে, তাহা স্বাধীন ভাবে প্রবাহিত হয়। সেখানে এক প্রকার স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে চিরবৈধব্য প্রচলিত নাই। সেখানে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেমন শাসন, আবার স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও তেমনি শাসন। দম্পতীরা, পরস্পরের সুখে সুখী। স্ত্রী সুশিক্ষিতা, পুরুষও সুশিক্ষিত। স্ত্রী যেমন পতির সহচরী, পতিও তেমনি স্ত্রীর সহচর। লোকের চক্ষুঃলজ্জা ও সামাজিক ভয় অধিকতর। স্বাধীন স্ত্রীমাত্রই যে ব্যভিচারিণী হইবে, এরূপ সকলে জ্ঞান করিতে পারে না। পুরুষজাতির সমধিক বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। স্ত্রীজাতির ধর্ম্মবল অধিকতর। পুরুষমাত্রই ত্বরায় ব্যভি

চারী হইতে পারে না। কারণ, বিবাহিত পুরুষমাত্রই স্ত্রীদ্বারা সুরক্ষিত। এই প্রকার সকল বিষয় যদি আমরা সম্যক্‌রূপে স্থির বুদ্ধিতে নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করি, তাহা হইলে আমরা স্বাধীন সমাজকে ব্যভিচারী সমাজ বলিয়া গণনীয় করিতে পারি না। সকল সমাজেরই ব্যবস্থা ও গঠন স্বতন্ত্র। কারণ বিশেষ বিশেষ কারণ জন্য সকল সমাজেই বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকে। তদ্দ্বারা সমাজের সংস্থিতি সাধিত হয়। এতদ্দেশেও প্রাচীন কালে স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল; তখনকার কালের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতিও স্বতন্ত্র ছিল।

ইদানীন্তন লোকসমাজে যে প্রকার সতীত্ব ধর্ম্মের ভাব প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকাংশে প্রতীত হইতেছে। আমরা স্ত্রীজাতির আন্তরিক সতীত্ব বড় দৃষ্টি করি না, তাহাদিগের দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। বাস্তবিক, হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্ববিষয়েই চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষা দৈহিক পবিত্রতাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গণনীয় হয়। গঙ্গাস্নান, শুদ্ধাচার, অন্ন ও পানীয় শুচিতায় তাহাদিগের অধিকাংশ ধর্ম্ম নির্ভর করে। তাহাদিগের ধর্ম্মের ভাবই এই প্রকার। সে যাহা হউক, পুরুষজাতি সহস্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াও দুশ্চারী ও অসল্লোক বলিয়া অভিহিত হয়েন না, কিন্তু দুর্ভাগ্য স্ত্রীজাতি প্রথম পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে গমন করিলেই দুশ্চারিণী ও অসতী বলিয়া অভিহিত হয়েন।

আমাদিগের সৎপুরুষের লক্ষণ এক প্রকার, সতীস্ত্রীর লক্ষণ অন্যবিধ। এই লক্ষণদ্বয় পরস্পর বিরোধী। অতএব আমাদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের সংস্কার সম্বন্ধে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতীর সতীত্ব ধর্ম্মের লক্ষণের সহিত অন্যান্য সভ্যসমাজের সতীত্ব ধর্ম্মের লক্ষণের মিল নাই। সেই ধর্ম্ম এতদ্দেশীয় পুরুষগণের মধ্যে যে রূপ চলিত, তাহার সহিত বরং ইয়োরোপীয় সমাজের সতীত্ব ধর্ম্মের লক্ষণের সামঞ্জস্য আছে। এদেশে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার বিবাহ করিয়া পুরুষগণ যেমন ব্যভিচারী নহে, ইয়োরোপীয় সমাজে স্ত্রীজাতিও তদ্রূপ করিয়া সতী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। বিরোধী লক্ষণদ্বয় উভয়ই কিছু এক ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ হইতে পারে না। এদেশে পুরুষজাতীয় লক্ষণে যদি ধর্ম্ম হয়, স্ত্রীজাতীয় লক্ষণে তবে অধর্ম্ম। ধর্ম্ম কখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় প্রকার হইতে পারে না। তবে পুরুষজাতীয় লক্ষণে যে অনেক উদারতা ও মানব প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি লক্ষিত হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ যখন আমরা বিবেচনা করি পুরুষজাতি শাস্ত্রকার হইয়া আপনাদের পক্ষে কেন অবিচার করিবেন, তখন পুরুষজাতির লক্ষণে অনেকাংশে ধর্ম্মভাব উপলব্ধ হয়। তবে সেই লক্ষণের একটা অঙ্গ আমাদিগের নিকট নিতান্ত মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এককালে বহুস্ত্রীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সহবাস কখন মানবপ্রকৃতি-সঙ্গত নহে। এই স্থলে পুরুষ জাতি অযথা ক্ষমতা গ্রহণ

করিয়াছে। এই নিয়মটী ব্যতীত সৎপুরুষের অন্যান্য নিয়ম তত যুক্তি অথবা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। সৎপুরুষের বিশুদ্ধ নিয়ম যখন আমরা স্ত্রীজাতিতে আরোপ করি, তখন আমরা সতীত্ব ধর্ম্মের একটী নূতন ভাব উপলব্ধি করি। যাহা স্বাভাবিক মানবীয় ধর্ম্ম, তাহা আপনাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছি, এবং প্রেমবিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া, স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্বের অধিকার বিস্তার করিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে একটী স্বতন্ত্র ও অস্বাভাবিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। তবে এক্ষণে সার কথা এই, যদি পুরুষজাতির লক্ষণ স্বাভাবিক বলিয়া মানবীয় ধর্ম্মানুমত হয়, স্ত্রীজাতির লক্ষণ তবে অস্বাভাবিক বলিয়া অবশ্য অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কারণ, একই ধর্ম্মের লক্ষণ কখন দ্বিবিধ হইতে পারে না। এতকাল ধরিয়া আমাদিগের স্ত্রীজাতি যে একটা অপ্রাকৃতিক নিয়মের পরতন্ত্র হইয়া, বিকৃত সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছে, ইহাই তাহাদিগের গৌরব, ইহাই তাহাদিগের সহিষ্ণুতার একশেষ বলিতে হইবে। স্বাধীনতায় অবস্থিত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে স্ত্রীজাতির ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার প্রকৃত উন্নতি-সাধন না হইলে, এবং তাহারা স্বাধীন ভাবে সুশিক্ষিতা না হইলে, মনুষ্য-সমাজের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

সপ্তমচিন্তা—উপসংহার।

স্বদেশীয় আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিতে কতদূর অধীনতার ভাব, কতদূর দাসত্ব বিদ্যমান আছে তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। দেবতার ন্যায় সম্মাননা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণজাতি, স্বকীয় বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে, এদেশীয় সভ্যতার নায়কস্বরূপ হইয়াছিলেন; এবং আপনাদিগেরই প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সমুদায় দেশ মধ্যে কেবল মূর্খতাও দাসত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে দিনে ক্ষত্রিয়গণকে একেবারে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দিয়া দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু হইলেন, সেই দিন হইতে তাহাদিগের প্রভুত্ব আরও অপ্রতিহত প্রভাবে দ্বিগুণতর বাড়িতে লাগিল। তখন হইতে তাঁহারা আপনাদিগকে দেবতাস্থানীয় বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং সেই কাল হইতে সর্ব্বজাতি মধ্যে ঘোর দাসত্বও স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়গণ দেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ যে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে লাগিলেন, তাহা রাজকীয় ক্ষমতার নিরপেক্ষ করিলেন, তাহাকে রাজকীয় ক্ষমতারও উপরে স্থাপন করিলেন। রাজা যেই হউন না কেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রভুত্বের কিছুই হানি হইবে না। তাঁহাদিগের প্রভুত্ব সমুদায় জাতিমধ্যে, এবং সমাজের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজা যেই হউক না কেন, রাজকীয় ক্ষমতা যেরূপই হউক না কেন, তাঁহাদিগের দেবার্চ্চনা, সেবা, ও স্বার্থসাধন কিছুতেই রহিত

করিতে পারিবে না,—তাঁহারা এইরূপ কৌশল পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। জাতিভেদ আনিয়া ব্রাহ্মণেতর সমুদায় জাতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তাহারা সকলেই পরস্পর এত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, যেন সকলেই এক এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়া পড়িল। তাহাদিগের পার্থক্য এতদূর যে, কাহারই সহিত কাহার অণুমাত্র সম্বন্ধ ও সহানুভূতি নাই। বিদেশীয় জাতিগণের মধ্যে পরস্পর যতদূর পার্থক্য, এই হিন্দুজাতি সমুদায় এক ধর্ম্মী, এক সমাজভুক্ত, ও এক দেশীয় হইয়াও পরস্পর তত পৃথক, ততদূর সহানুভূতি ও সম্পর্ক-বিরহিত। কেবল ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের সহিত আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির সূত্র বন্ধন করিলেন। সকলকে পরস্পর পৃথক করিয়া দিয়া, সকলের সহিত কেবল আপনাদিগের সম্বন্ধ রাখিলেন। একতা হিন্দুজাতি হইতে একেবারে অদৃশ্য হইল। মূর্খতা সকল ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রধান ধর্ম্ম হইল। ক্রমে ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বজাতি ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া বিবেচনা ও বুদ্ধিবল সকলই হারাইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে প্রভুতায় আরও ঘেরিয়া লইলেন। নানাবিধ শাস্ত্র তাহাদিগের প্রভুতার অস্ত্র স্বরূপ হইল। সর্ব্বশাস্ত্রেই ব্রাহ্মণজাতির দেবপূজা নির্দ্দিষ্ট হইল। অগ্নিদাহে, কি বজ্রাঘাতে, কি যমদণ্ডে তোমার সর্ব্বনাশ হউক, তথাপি ব্রাহ্মণকে তোমার দান করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণগণ আশ্রমে বসিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেন, কিন্তু তথায় শত অতিথি আসিলেও

পর্য্যাপ্ত আহার ও সৎকারে সন্তুষ্ট হইয়া যাইত। সমাজের অর্থ-গ্রহণের কল পাতিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে ধ্যানে নিরত হইলেন। নির্ভাবনায় আহার করিতেন, আর ধ্যান করিতেন। সমাজকে অধঃপাতে দেওয়াতেই তাহাদিগের স্বার্থসিদ্ধি। রাজা, প্রজা, সকলেই ব্রাহ্মণভয়ে কণ্ঠস্থ। সমাজের স্তরে স্তরে দাসত্ব অনুবিদ্ধ করিয়া দিয়া, দেশীয় আচার-ব্যবহারের সহিত দাসত্বের ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃই আপনাদিগের প্রভুত্ব বাড়াইতে লাগিলেন। তাহাই সমাজ মধ্যে বরাবর চলিয়া আসিতেছে। এই প্রভুত্ব রাজকীয় ক্ষমতার নিরপেক্ষ বলিয়া ক্রমশঃ রাজকীয় ক্ষমতা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার সহিত প্রাচ্য সভ্যতার প্রভিন্নতা এই যে, ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূলে স্বাধীনতার ভাব বিদ্যমান আছে, প্রাচ্য সভ্যতার মূলে অধীনতাই প্রবল। এজন্য ইয়োরোপে যখন একদা পোপের প্রভুত্ব স্থাপন হইতে লাগিল, স্বাধীনতার ভাব তখন রাজকীয় বল ও প্রজাদিগের বীর্য্য রক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে পোপের প্রভুত্ব যখন শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন স্বাধীনতা আর ধর্ম্মশাসন মানিলেন না। আস্তে আস্তে ক্রমে আপনার স্বর স্ফূরিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এই সাধারণ স্বাধীনতার সহিত ইয়োরোপীয় পুরোহিত দলের ধর্ম্মযুদ্ধের বিবরণ ইয়োরোপীয় ইতিহাসে লিখিত আছে। পুরোহিতগণের পরাভব ও সাধারণ-জনগণের স্বাধীনতার জয় এই ইতিবৃত্তে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত

হইয়াছে। এই যুদ্ধে ইয়োরোপীয় স্বাধীনতা দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। ধর্ম্মশাসন রাজকীয় শাসনের অধীন হইল। বাস্তবিক এই যুদ্ধের অবসান কাল হইতেই ইয়োরোপীয় সভ্যতার এত উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইয়োরোপীয় উন্নতির দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইয়োরোপে যে যুদ্ধ উন্নতির মূল, ভারতে সেই যুদ্ধ অবনতির মূল। ভারতে ব্রাহ্মণগণেরই জয় হইল, অন্য সকল জাতির পরাজয় হইল। ভারতীয় সভ্যতার দাসত্ব ও অধীনতার ভাবই তাহার সামাজিক অবনতির কারণ।

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ইয়োরোপীয় সভ্যতার কতিপয় প্রধান ধর্ম্ম ও লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। সেই ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান ধর্ম্ম যে স্বাধীনতাভাব, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট প্রতীত হইবে। স্বাধীন দেশে স্বাভাবিক স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেম শনৈঃ শনৈঃ সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্বাধীনভাবে মানবপ্রকৃতির স্ফূর্ত্তি হইলে, তাহার সকল সৎপ্রবৃত্তিরই স্ফূর্ত্তিসাধন হয়। অতএব স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের স্ফূর্ত্তি অনেকাংশে স্বাধীনতার উপরই নির্ভর করে। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিবরণের পর আমরা ইয়োরোপীয়গণের চরিত্র-গুণ পর্য্যালোচনা করিয়াছি। সেই পর্য্যালোচনায় দৃষ্ট হইয়াছে, মানবের যত উচ্চতর গুণ ইয়োরোপীয় চরিত্রে সমাবিষ্ট আছে। যে গুণে মানব-সমাজের উন্নতিসাধন হয়, সেই গুণ সকল ইয়োরোপীয়গণের চরিত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্বাধীনতা মানবপ্রকৃতির স্ফূর্ত্তিসাধন

করিয়া যে সমস্ত গুণের উদ্রেক ও উত্তেজ করে, সেই সমস্ত মহৎগুণ ইয়োরোপীয় চরিত্রে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্যোগিতা, সাহস, তেজ, বল ও বীর্য্য ইয়োরোপীয় চরিত্রের প্রধান গুণ। যে উদ্যোগিতা ও অসমসাহসিকতা গুণে ইংরাজগণের এত উন্নতি, যে জন্য তাঁহারা স্বদেশের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ভুবনবিজয়ী হইয়াছেন, স্বাধীনতাই তাহার মূল।

যে স্বাধীনতাভাব ইয়োরোপীয় সমাজের সর্ব্বোন্নতির কারণ, আমাদিগের স্বদেশীয় আচার ব্যবহারে কতদূর তাহার অভাব, তাহাই পর্য্যালোচনা করা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। সেই পরিচ্ছেদ পড়িয়া প্রতীত হইবে যে, অধীনতা এ দেশীয় সমাজের স্তরে স্তরে প্রবিদ্ধ আছে। কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, কি সামাজিক, এদেশে কোন প্রকার স্বাধীনতাই নাই। আমাদিগের সমাজকে ঠিক ইয়োরোপীয় আদর্শে সংগঠিত করিয়া আনিতে বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা বলি, আমাদিগের সমাজের অধীনতা ও দাসত্বের ভাব উন্মোচন করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। কারণ, ইহাই আমাদিগের অধোগতির মূল। এতৎপরিবর্ত্তে ইয়োরোপীয় সমাজের স্বাধীনতার ভাব আমাদিগের গ্রহণ করা উচিত। আমাদিগের সমাজের মূলভিত্তিই দূষিত, সেই মূলভিত্তিকে একেবারে উৎপাটন করিয়া, সমাজকে আর এক নূতন মূলভিত্তির উপর স্থাপন করা এক্ষণে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এ দেশীয় সমাজ স্বাধীনতার

মূলভিত্তির উপর স্থাপিত হইলে যে, এই সমাজ ঠিক ইয়োরোপীয় সমাজের আকার ধারণ করিবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, এদেশীয় বাহ্য প্রকৃতি বিভিন্ন, এবং মানব প্রকৃতিও তজ্জন্য কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া আসিবারই সম্ভাবনা।

যথেচ্ছাচারিতা, ও সামাজিক বিভাগের পরস্পর নির্ভর ভাব যে স্বাধীনতা হইতে বিভিন্ন, তাহা প্রদর্শন করা বোধ হয় আবশ্যক নহে। যাহারা স্বাধীনতার প্রকৃতি বুঝিয়া দেখিবেন, তাহারা এ বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। মানব-সমাজ বিভক্ত হইলেই যে সেই বিভাগ সকল পরস্পর সাহায্যাবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা অধীনতা ও দাসত্ব নহে, তাহা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাব, তাহা মানবসমাজের প্রয়োজন ও একান্ত আবশ্যক। তাহা স্বাধীনতার বিরোধী নহে, বরং তাহা স্বাধীনতার অবলম্বন ও বল। যথেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতার ফল নহে, বরং ইহা অধীনতারই ফল। যে দেশে অধীনতা ও দাসত্ব অত্যন্ত অধিক, সেই দেশেই প্রভুবল যথেচ্ছাচারী হইতে পারে। স্বাধীনতার উচ্ছেদেই যথেচ্ছাচারিতার সম্ভব। স্বাধীনতা হইতে যে যথেচ্ছাচারিতা প্রসূত হয়, তাহা নিজ দোষ সপ্রমাণ করাইয়া স্বাধীনতা হইতে কতদূর হেয়, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া, স্বাধীনতারই সমাদর বর্দ্ধিত করিয়া দেয়।

বর্ত্তমান স্বদেশীয় সমাজে স্বাধীনতাভাবের কতদূর অভাব, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি;

এক্ষণে তাহাতে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম কতদূর বিদ্যমান, তাহা একবার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম মানব মনে স্বভাবতঃই সঞ্চারিত হয়; স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির সহিত সেই ভাবদ্বয়েরও স্ফূর্ত্তি-সাধন হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই ভাবদ্বয় ক্রমশঃ কেমন লয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে নানাবিধ ভারতবাসিগণের মধ্যে সেই ভাবদ্বয়ের কেমন একান্ত অভাব হইয়াছে, তাহাই আমরা দেখাইতে চাহি। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাচ্য দেশে ঘোর সামাজিক অধীনতা বিরাজিত থাকিলেও সেখানে স্বাভাবিক স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব নাই। তাহার কারণ এই, সে সমস্ত জনপদবাসিগণ ভারতবর্ষীয়গণের ন্যায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। সকলেরই মধ্যে এক জাতীয়ভাব বিদ্যমান আছে। তাহাদিগের দেশ এক, ধর্ম্ম এক, জাতি এক, পরিচ্ছদ এক, ভাষা এক, এবং সকলই এক রাজার অধীনস্থ। সেই জনপদবাসিগণ সকলেই একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ। তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ও মিলন-সূত্র বিচ্ছিন্ন নহে। তাহাদিগের স্বদেশ কি, তাহারা সকলেই জানে। অনেকবার বিদেশীয় শত্রুর বিপক্ষে তাহারা স্বদেশের জন্য অস্ত্র ধরিয়াছে; এবং তৎপরে ভবিষ্যৎ পরাজয় নিবারণার্থ স্বদেশকে নানা বলে বলীয়ান করিয়াছে। যদিও এক এক দেশের এক এক প্রকার সামাজিক অধীনতার

জন্য, তাহাদিগের সভ্যতার উন্নতি হয় নাই; কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অধিক হ্রাস হয় নাই। তবে স্বাধীন ইয়োরোপীয় সমাজে যেমন এই দুই ভাবের প্রকটন সর্ব্বদাই দেখা যায়, উহাদিগের উদ্রেক ও সম্বর্দ্ধন-সাধনের কারণ যেমন সর্ব্বদাই ঘটিতেছে, এরূপ প্রাচ্য রাজ্যের অধীনক্ষেত্রে হইতে পারে না। যাহা হউক, ভারতবর্ষের নানাবিধ অধিবাসিগণের মধ্যে এই দুই ভাবের কেমন অভাব, তাহা এক্ষণে কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা যাউক। এই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভারতবর্ষ কাহার দেশ।

এ কথার সদুত্তর দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। যাঁহারা আজি ভারতের অধিপতি, সেই শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ জাতি কি ভারতকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন? তাঁহারা আপনার বলিয়া স্বীকার করিলে ভারতের ভাগ্য একদিন ফিরিয়া যায়। তাঁহারা কেন দাসের দেশকে আপনার বলিবেন? ঐ দেখ তাঁহারা গৌরবে পূর্ণ হইয়া বলিতেছেন, ভারত কেন আমাদিগের হইবে, আমরা ভারতের রাজা, ভারত আমাদিগের বিজিত দেশ। আমরা ভারতকে যথাবিধ শাসন করিব, তাহাকে শিক্ষা দিব, তাহার সন্মার্গ দেখাইয়া দিব, এবং যতদূর সাধ্য, তাহার উন্নতি-সাধন করিব। আমরা ভারতে প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছি, বাণিজ্যার্থ আসিয়াছি, এবং আধুনিক সভ্যতার সুখ স্বচ্ছন্দতা ভারতে বিস্তার করিতে

আসিয়াছি। ভারত কেন আমাদিগের হইবে? ভারতে বাস করিয়া কি আমরা উৎসন্ন যাইব, বিলাসী হইব এবং আপনাদিগের স্বাধীন রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানকার একাধিপত্যের বশবর্ত্তী হইব? এরূপ কখন হইবে না। আমাদিগের দেশ সেই সুখময় স্বাধীনতার ধাম, যেখানে সকলই স্বচ্ছন্দে, মনের আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। যেখানে বসন্ত ঋতু অগ্রে উদিত হইয়া দেশময় প্রসূন নিকরে সুশোভিত করেন। যেখানে পবনদেব পশ্চিম সমুদ্র হইতে সুশীতল হইয়া মৃদু মৃদু শান্তি সঞ্চারণ করিয়া বেড়ান। যেখানে স্বাধীনতা-দেবী স্বচ্ছন্দে বায়ুর মত সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সকলকে সজীবতায়, উৎসাহে ও আনন্দে পূর্ণ করিতেছেন। যেখানে বাণিজ্য-পোত পতাকা বিস্তার করিয়া নানা দিক-দেশাৎ প্রভূত ধনরাশি আনিয়া গৃহে গৃহে ঢালিয়া দিতেছে। যেখানে সামুদ্রিক সেনা গৌরবের নিশান তুলিয়া সাগরময় বৃটিশ রাজ্যের জয়ঘোষণা করিতেছেন। যেখানে রাজমন্ত্রী ও রাজনীতিজ্ঞেরা গম্ভীর ভাবে বসিয়া দেশের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও পৃথিবীর ভাগ্য নির্ণয় করিতেছেন। যেখানে প্রতি দেশবাসী, প্রতি রমণীহৃদয় ও স্বদেশানুরাগে পূর্ণ হইয়া দেশের মঙ্গল-সাধনে যথাসাধ্য যত্নশীল ও উদ্যোগী হইতেছেন। যেখানে উদ্যোগিতা, সাহস, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা একান্ত-পরিশ্রমে মানব-নামের গৌরব-বৃদ্ধি করিয়া পুরুষত্বের পরাকাষ্ঠা পৃথিবীতে প্রদর্শন করিতেছেন। যেখানে আমাদিগের জন্য, সে দেশের

কুক্কুর পর্য্যন্ত দেশের ও গৃহের নিতান্ত অনুরাগী। যে দেশ আমাদিগের দেশ, সে দেশ সাগরসম্ভূত রত্নময় বৃটিশ-দ্বীপ;—যে দ্বীপের মহারাজ্যে দিনদেব কখন অস্ত যান না। আমরা সেই রত্নাকরের রত্ন-রাজ্যে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া কেন অধমতম ভারতকে জননী ও স্বদেশ বলিতে যাইব? ভারত যদি আমাদিগের জননী হইতেন, তাহা হইলে আজি ভারতের ভাগ্য কি এরূপ হয়! তাহা হইলে আজি ভারতের দর্পে মেদিনী কম্পিত হইত, ভারতের গৌরবে পৃথিবী পূর্ণ হইত, এবং ভারতের মুকুটমণির উজ্জ্বল বিভায় জগৎ প্রভাসিত হইত।

আমাদিগের গৌরাঙ্গ প্রভুদিগের এই কথা। আর যাহারা এককালে আমাদিগের প্রভু ছিলেন, এখন যাহারা ভারতের সর্ব্বত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বকলঙ্ক স্বরূপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন, সেই অগণ্য মুসলমানেরা কি বলেন। তাঁহারা ত বহুকাল ভারতের অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তবু কি বলেন? তাঁহারাও বলেন ভারত কেন আমাদিগের হইবে? আমরা যাহার বংশধর তাহাদিগের নামে আজিও পৃথিবী কম্পিত হয়। আমরা ভারতের বাদসাহের জাতি, নবাবের বংশ। দেখনি কি এখনও আমাদিগের নবাবীচাল যায় নাই। আমরা যে নবাব ও বাদসাহ ছিলাম, পারি যদি, আর কখন আবার সেই নবাব ও বাদসাহের সিংহাসনে বসিয়া মনের সাধ মিটাইয়া লইব। তোমরা, বাঙ্গালী, তোমরা দাসের জাতি, তোমরা আমাদিগের সহিত মিলিতে আস কেন?

আজিও আমাদিগকে নবাব বলিয়া মান্য কর। এ ভারত যে আমাদিগের এক কালের রাজ্য ছিল, এ ভারত আমাদিগের দেশ হইবে কেন? আমাদিগের দেশ তাতার, মঙ্গোলিয়া, পারস্য ও মক্কা। আমাদিগের ভাষা দেশী ভাষা নহে, আমরা আরবী পড়ি, ফার্সী কণ্ঠস্থ রাখি, এবং ছাঁকা উর্দ্দুতে কথা কই। দেখনি কি আমাদিগের কথা বার্ত্তায় এখনও সেই নবাবী ধরণ, নবাবী সেরেস্তা, বোল চাল রহিয়াছে। মক্কা আমাদিগের তীর্থ স্থান, ভারত আমাদিগের কিছুই নহে। তুর্কেরা আমাদিগের স্বজাতি, এবং তাহাদিগের অভ্যুদয়ের প্রতি আমরা অহরহঃ তাকাইয়া আছি। তোমরা হিন্দু আমাদিগের হইতে পৃথক্ থেক।

এই ত আমাদিগের পূর্ব্ব বাদসাহের কথা। দেখি যাহাদিগকে আমরা এদেশের আদিম অধিবাসী বলি, তাহারা কি বলে? সেই অসভ্য পাহাড়ীয়া ও বন্য জাতিদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, ভারত আবার কি? ভারত আবার কোন্ দেশ? তাহারা কখন ভারতের নাম মাত্র শ্রবণ করিয়াছে কি না সন্দেহ। তাহারা জানে, যে বনে আমরা বাঘ মারিয়া শিকার করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াই, ও এক এক বার এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া দেখি কার কি আছে, সেই ঘনবৃক্ষাচ্ছাদিত, অসূর্য্যম্পশ্য, অরাতি-বিদূর, দুর্ভেদ্য ও নির্ব্বিঘ্ন বন্যরাজ্য আমাদিগের স্বদেশ। তাহারা যেন কহিতেছে, তোমরা সে দেশকে যাই বলিয়া

ডাক, আমরা তোমাদিগকে সে দেশের নাম পর্য্যন্তও শুনাইব না, সে দেশের কোন বার্ত্তাও তোমাদিগকে দিব না। তোমরা কি জানিবে, আমাদিগের পার্ব্বতীয় গহ্বরের কত আদর? তোমরা কি জানিবে, আমরা কেমন বীর জাতি? আমরা সিংহ শার্দ্দূলের সহিত একত্রে বাস করি, সুখে উপত্যকায় বিচরণ করিয়া বেড়াই; পার্ব্বতীয় প্রসূনরাশি আমাদিগের কামিনীর শিরোভূষণ হয়। বাহ্য জগতের সহিত আমাদিগের সম্পর্ক নাই। এই উপত্যকা ভূমি নির্ব্বিঘ্ন থাক্, এই বনদেশ অক্ষুণ্ণ থাক্, এই বাহুতে বল থাক্, এই ধনুতে টঙ্কার-ধ্বনি থাক্, এবং তূণীরে তীর থাক্, আমরা আর কিছুই চাহি না। আমরা পৃথিবীর সুখ সম্পত্তির প্রয়াসী নই, সভ্যতার সুখাভিলাষী নই, নরপতির তোষামোদ জানি না, আমরা তোমাদিগের দেশে গিয়া কি করিব। এখানে আমাদিগের পর্ব্বতের নির্ঝরে ও বৃক্ষাচ্ছাদিত নদীতে নির্ম্মল বারি আছে, বনে ও গহ্বরে অগণ্য শিকার আছে, বাহুতে বল আছে, ভূমিতে ও বৃক্ষশিরে শয্যা আছে, আমরা তোমাদিগকে চাহি না, তোমাদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহি না, আমরা জঙ্গুলে, আমরা ধাঙ্গড়, আমরা সব, আমাদিগের সহিত তোমাদিগের মিশিতে হইবে না। যখন ক্ষুধায় মরিব, ইংরাজগণের সঙ্গে জাহাজে চড়িয়া কোন দ্বীপে গিয়া না হয় শরীর খাটাইয়া খাইব। তাহার জন্য ভাবনা কি? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কে? বলিব আমরা জঙ্গুলে, তাহাদিগকে আমাদিগের দেশের

নাম পর্য্যন্তও বলিব না। ভারত আবার কি, ভারত আবার কোন্ দেশ?

আর ঐ ফিরিঙ্গি জাতি—যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অগ্রে পাশ্চাত্য, স্বদেশানুরাগী ইয়োরোপীয় জাতি বলিয়া গৌরব করিতেন,—তাহাদিগের বংশীয়গণ এক্ষণে ভারতের অধিবাসী হইয়া কি বলেন? হায়, রজনী আসিলে কি পশ্চিম দেশে সূর্য্য-গৌরবের কোন রশ্মি রেখা মাত্র থাকে না! কোন কোন ফিরিঙ্গির বাক্যবাণ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। তাহারা বলে, কালা বাঙ্গালি, ফের যদি বলিবে ভারত আমাদিগের দেশ, একটী ঘুসিতে তোমাকে ভূমিসাৎ করিব। দেখনি কি, আমাদিগের জ্যাকেট আছে, পেণ্টুলন আছে, টুপী আছে, আর আমাদিগের বিলাত আছে? আমার জনক জননী যখন বিলাত হইতে আসে, আমি তখন সমুদ্রের মাঝে জাহাজের উপর জন্মগ্রহণ করি। আমি ইণ্ডিয়াতে জন্মি নাই; হাঁ, তবে আমার ছেলেপিলে এখানে জন্মিতেছে বটে; কিন্তু কি করি নাচার, আমি তাহাদিগকে শীঘ্র বিলাতে পাঠাইয়া দিব। তুমি আমাকে এ দেশী বল না, আমি সাহেব লোক। জান, আমি আমার ধর্ম্মবাপকে বলিয়া এখনি তোমায় জব্দ করিতে পারি। জানিস আমি কিছু টাকা জমাইয়া কি আর এদেশে থাকিব। পেন্সন লইয়া বিলাত চলিয়া যাইব। কালা বাঙ্গালি, নিচু যাও। তোমরা হিন্দু, তোমরা চাকরের জাত। জান, আমি সাহেব লোক। জন—আমার বাবার নাম।

আমার মার নাম চুন্নী। তুমি এখন যাও, আমি জাহাজের কাপ্তেনের কাছে, দেশের কে কেমন আছে, খবর জানিতে যাইব। সাবধান, আর কখন জিজ্ঞাসা করিও না—তুমি কি ইণ্ডিয়ান? ইণ্ডিয়ান বলিলে আমাদিগের লজ্জা ও অপমান হয়। ইউ ইণ্ডিয়ান ডগ্, বি অফ্।

আর বঙ্গবাসি, তুমি যে এতদূর উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছ, তোমার মূর্ত্তি ও রূপ দেখিয়া ভারত-জননী অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। তুমি যখন শাকান্নের ক্ষীণ নাড়ীতে টই টুম্বুর করিয়া ব্রাণ্ডি ঢালিয়া রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ কর এবং লেক্চার দিতে দিতে গান ধরিয়া উঠ ঃ—

"নেশাতে ঢুলু ঢুলু করতেছে নয়ন।
কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন ॥"

বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ কর, এবং তৎপরে বাটীর মধ্য হইতে চীৎকারধ্বনি উঠে,—শুনিতে পাওয়া যায়, তোমার বৃদ্ধ মাতা মারের চোটে ধরাশায়িনী, নিরীহ ভার্য্যা ধরিতে গিয়া বিলক্ষণ ঘুসি খাইয়াছেন এবং শিশু সন্তানটী গলাটেপার দরুণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। তোমার এই পশুবৎ ব্যবহারে ভারতজননী নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছেন। যাহার আত্ম-স্বজনের প্রতি এত মমতা ও স্নেহ, তাহার স্বদেশের প্রতি কি কিছু অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা আছে? আর উনি কে, ঐ যে ট্যাসের মামা সাজিয়া চসমা নাকে প্রাতঃকালে বায়ু-সেবন করিতে বহির্গত হইয়াছেন, উনি কি আমা-দিগের রিফর্ম্মার? উহাকে কি ভারত-জননী চিনিতে

পারিবেন? কই উহাকে চিনিবার ত কোন চিহ্ন নাই। উহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে উনি বলিলেন, অগ্রে আপনার উন্নতি-সাধন কর, সভ্য হও, পরে বঙ্গসমাজের উন্নতি, পরে ভারতের কথা, যদি উন্নতির সোপানে উঠিতে চাও, ধর্ম্মসাহসী হও, এবং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কর; বৃদ্ধ ভারত জননীকে এক সুট গাউন পরাও, তবে তিনি সভ্য সমাজে আদরণীয় হইবেন। আমার মত যখন তোমরা ধর্ম্মসাহসী হইতে পারিবে, তখন তোমাদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। আমি বিলাতে না যাইয়াও দেখ কত ধর্ম্ম-সাহস ধারণ করি। যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন, তাহারা ত সাহেব সাজিবেনই, যেহেতু তাহাদিগের জাত গিয়াছে। আমি বিলাতে না গিয়াও সাহেব। তোমরা সরিষার তৈল পরিত্যাগ কর, সাবান মাখ, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কর। অনেক দিন সাহেব হইয়াও আমার আঁতুড়ে তৈলের গন্ধ এখনও ঘুচিতেছে না, কিন্তু অনেক গিয়াছে, আর কিছুদিন হইলে সমুদায় যাইবে। তোমরা কাছে আসিলেই আমি সরিষার তৈলের গন্ধ পাই। তোমরা এত পড়া শুনা কর কিসের জন্য? কবি গে তোমাদিগের মত জাতির জন্য একটী সদুপদেশ-পূর্ণ গল্প রচিয়াছেন *। কবি গের গল্প সমূহের কি মর্ম্মগ্রহ হয় নাই? তবে তোমরা এখনও কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের উন্নতির পথ

---

* The Monkey who had seen the world.

পরিষ্কার করিয়া দেও। আমাদিগের ভারত-সন্তান ও রিফর্ম্মারের কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। পার্শ্বে ভারত-জননী দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছিলেন, তিনিও শুনিয়া ক্ষণিক নীরব হইয়া রহিলেন, পরে পৃথিবীতে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমুদ্রে জলমগ্ন হইতে গেলেন।

বাঙ্গালী জাতির নিকট ভারত-জননী কি এই-আশা করিয়াছিলেন? বাঙ্গালী জাতির উচ্চ শিক্ষার কি এই পরিণাম হইল? বাঙ্গালী জাতি কি কেবল বাক্-পটু হইয়া থাকিলেন? সেই জাতির উচ্চ শিক্ষিত দুই এক জন ভারত-সন্তান বলিয়া চেঁচাইলেও ভারত-জননী তাহাকে কোলে করেন না; যেহেতু তিনি জানেন, সে রব তাঁহার হৃদয় হইতে উত্থিত হয় নাই। অতএব হে কৃতবিদ্য বাঙ্গালি, তুমি কেন চেঁচাইয়া মর, আমি ভারত-সন্তান, ভারত-সন্তান। বঙ্গ কবি, তুমি ভারত-সন্তানের গীত গাইয়া কাহার হৃদয় উচ্চ করিতে চাও। ও ত তোমার স্বাভাবিক রব নহে। তুমি যেন পড়া পাখীর মত রব করিতেছ। কই উহাতে ত কাহারও মন ভিজে না, হৃদয় আর্দ্র হয় না। পাখীর স্বাভাবিক সুস্বর গীতের মত উহা ত হৃদয় মন মাতাইয়া তুলে না। কেবল পাখী কেমন পড়িতে শিখিয়াছে, এই দেখিয়া একটু আনন্দ জন্মে মাত্র।

কৃতবিদ্য জনকত বাঙ্গালী ছাড়িয়া, সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে দেখ;—তাহারা কি বলেন আমরা

ভারত-সন্তান? তাহারা কৃতবিদ্যগণের নূতন নূতন কার্য্য কলাপ দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাহারা চিরকালই ত বাঙ্গালার নাম জানিতেন। "ভারতবর্ষ" এখন তাহারা ছেলে পড়াইতে পড়াইতে ইংরাজী অনুবাদ বাঙ্গালা ভূগোলে দেখিয়াছেন। নহিলে পূর্ব্বে ইহার নামও শুনেন নাই। পূর্ব্বে জানিতেন পৃথিবী ত্রিকোণ; এখন জানিলেন ভারত ত্রিকোণ, অতএব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারত ত্রিকোণ-পৃথিবী বিশেষ। তাহারা জানেন আমরা বাঙ্গালী জাতি; সমুদায় ভারতবর্ষের সহিত আমাদিগের সম্পর্ক কি? "সত্য আমরা জননী জন্ম ভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী তুল্য জানি। কিন্তু সে জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে। আমাদিগের জন্মভূমি কোন গ্রাম, পল্লী, অথবা পল্লীস্থ সেই ক্ষুদ্র-পরিসর স্থান মাত্র যেখানে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছি। আমাদিগের উদাসীনেরা এক যুগের পর এক দিন আসিয়া জন্মভূমি দেখিয়া যান, এবং মনে করেন তাহাতেই সাত তীর্থের পুণ্য সঞ্চয় হইল।" আমরা শুদ্ধ নিজ-গ্রাম মাত্রকে আপনার জ্ঞান করি। যখন বিদেশে থাকি, বড় জোর আমরা বলি, বঙ্গদেশ আমাদের দেশ, তাহাতেও আবার পদ্মাপারস্থ পূর্ব্ববাঙ্গালাকে ছাড়িয়া দিই। কারণ, সে দেশ আমাদিগের বলিলে আমাদিগের বাপ হয়; গালাগালি হয়। ভারতের অপরাপর দেশবাসীকে আমরা কি স্বজাতীয় জ্ঞান করি? স্বজাতীয় জ্ঞান করা দূরে থাক, আমরা জানিও না, ভারতের কোথায়

কোন্ জাতি বাস করে। ভারতের কোন জাতীয় লোককে বাঙ্গালায় নূতন দেখিলে জ্ঞান হয়, তাহারা পৃথিবীর কোন দূর দেশস্থ লোক হইবে। একজন চীন কি মগ, কি মান্দ্রাজী, কি ফরাসী, কি পঞ্জাবী, কি ভুটিয়া, কি মহারাষ্ট্রীয়, কি গুজরাটী, ইহাদিগের সকলকেই আমরা সমান চক্ষে দেখিয়া থাকি। কারণ, আমাদিগের পক্ষে ইহারা সকলেই সমান বিদেশী। আমাদিগের দেশ, শুদ্ধ আমরা যেথানে বাস করি; তদ্ব্যতীত আর সমুদায় বিদেশ, তৎপ্রতি আমাদিগের অণুমাত্র অনুরাগ নাই। কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইবার সময় নিজ গ্রামের কুকুরটাও ছুটে আসিতে দেখিলে যত আনন্দ হয়, অপর গ্রামের শিরোমণি মহাশয়কেও দেখিলে তত আনন্দ হয় না। বাঙ্গালীর ভারত, তাহার নিজ গ্রাম বা পল্লী, তাহার জন্মস্থান,—দ্বিপাদ মাত্র ভূমি-খণ্ড। তবে আমরা ভারত-সন্তান, ভারত-সন্তান বলিয়া চেঁচাই কেন? অগ্রে মন হইতে এই সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভাব বিদূরিত করি, হৃদয়কে বিসারিত করিতে শিখি, অগ্রে সকলকে ভালবাসিতে শিখি, সকলের জন্য কাঁদিতে শিখি, তবে ত ভারতসন্তান বলিতে যোগ্য হইব। নহিলে বাঙ্গাল বলিলেই যখন চটিয়া উঠি, উড়েকে মনুষ্য জ্ঞান করি না, তখন আমরা আবার ভারতসন্তান কি? সমগ্র ভারতের প্রতি কি আমাদিগের অনুরাগ আছে? কণামাত্রও নহে। তবে ভারত কাহার?

তবে ভারত কি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য জাতির? এক

দিনের তরেও নহে। সে দিন মাত্র, সিপাহী-বিদ্রোহে, সিপাহীরা আমাদিগকে ইংরাজগণের সঙ্গে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়াছে। তাহাদিগের কি জ্ঞান ছিল, বাঙ্গালী তাহাদিগের স্বদেশীয় ও স্বজাতি। কি পশ্চিমাঞ্চলে, কি বোম্বাইয়ে, কি পঞ্জাবে, কি মান্দ্রাজে, কি উড়িষ্যায়, ভারতের সর্ব্বত্রেই একই ভাব। আমরাও যেমন বোম্বাই বাসীকে ভাবি, বোম্বাইবাসীও আমাদিগকে ঠিক তদ্রূপই ভাবে। তাহার অণুমাত্র প্রভেদ নাই। পঞ্জাবীরা জ্ঞান করে, তাহাদিগের দেশ লাহোর। উড়েরা জানে তাহাদিগের দেশ উড়িষ্যা। মান্দ্রাজবাসীর সহিত বোম্বাই বাসীর কোন সম্পর্ক নাই। তদ্রূপ মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত গুজরাটীর; এবং গুজরাটীর সহিত তৈলঙ্গীর। পার্সীরাও জানে তাহাদিগের দেশ ভারতবর্ষ নহে; তাহারা বিদেশী। তাহারা যখন ভারতভূমিতে উপনিবেশী হয়, তখন যেমন আপনাদিগকে বিদেশী জ্ঞান করিত, এখনও ঠিক তেমনিই করে। তাহারা আজিও সমান বিদেশী হইয়া আছে,—চিরকাল থাকিবে। আমরা আজিও, এই অধঃপতনের পরও যখন আপনাদিগকে আর্য্যবংশীয় ভাবিতেছি, আর ধাঙ্গড়, ভীল, কুকী জাতিকে আমাদিগের বিজিত জাতি ভাবিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি, আমরা আর্য্য আর্য্য বলিয়া যখন ঘোর রব তুলিয়াছি, তখন যে পার্সীরা ভাবিবে, ভারত আমাদিগের নয়, ইহা আর বিচিত্র কি?

ভারত কোন কালেই কোন এক নির্দ্দিষ্ট জাতির হয়

নাই। ভারতকে কোন কালেই কেহ আপনার বলিয়া জ্ঞান করে নাই। ভারত চিরকাল বিভিন্ন দেশ, ও বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল দেশ ও রাজ্য একেবারে নিঃসম্পর্কীয় ছিল। রামায়ণ দেখ, মহাভারত দেখ, হিন্দুদিগের পূর্ব্ব গ্রন্থাদি বিলোড়ন কর, দেখিতে পাইবে, ভারত চিরকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রায় সমান প্রতাপশালী ও হীনবল ছিল। কোন রাজা কখন একটু বলবান হইয়া উঠিয়াছেন অমনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। এক জন তাহার বাহুবলে পরাস্ত হইলে সকলেই তাহার পরাভব স্বীকার করিয়াছে। কারণ, সকলেই প্রায় সমান বলবান। দিগ্বিজয়ী নরপাল দেশে ফিরিয়া আসিয়াই ভাবিলেন, আমার সমুদায় কার্য্য শেষ হইল, আমি এখন অদ্বিতীয় নরপাল হইলাম, আমার গৌরবের শেষ নাই। অমনি অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল। অশ্ব নির্ব্বিরোধে যজ্ঞে ফিরিয়া আসিল। আর তাহার জয়ের সীমা কি! সমস্ত ভূপালগণ তাহার করতলস্থ। তখন তিনি কাহারও সহিত সন্ধিবদ্ধ করিলেন। কাহারও রাজ্য কাড়িয়া পরকে দিলেন; তিনি আপনার মানে আপনি মনে মনে ফুলিয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সে নিয়মে দম — তিনি পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনি নিজ দেশের নৃপতি মাত্র। দুই দিন না যাইতে যাইতে আবার সকলি নূতন হইয়া গিয়াছে, সকলই পূর্ব্বাবস্থ হইয়াছে। তাহার উত্তরাধিকারী দেখেন, কোন রাজাই তাহার বশবর্ত্তী

নহে। অশ্বমেধের ঘোড়া যতদূর বেড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, ততদূর জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী মনে করিয়াছিলেন, আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছি। তাহার সসাগরা পৃথিবী সেই অশ্বের ভ্রমণ-দেশ পর্য্যন্ত, আর তাহার অধীশ্বরত্ব সেই যজ্ঞ পর্য্যন্ত। কেহ কখন জানেন নাই, ভারত আমার রাজ্য, আমি ভারতের একাধীশ্বর।

মুসলমান রাজত্বের সময়েও ভারতে সকলেই স্ব-স্ব প্রধান। ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবীতে ও রাজত্বে বিভক্ত। তখন সকলেই আপন আপন দেশের অধিস্বামী। এই অধিস্বামীগণের রাজ্য ব্যতীত সকল দেশেই গণ্ডগোল, গোলযোগ, বিদেশ, বীরভূমি। সেখানে যাইবার যো নাই, থাকিবার যো নাই। আপনি যে স্থানে আছি সেই পর্য্যন্ত আপনার। সমুদায় ভারতকে আপনার ভাবা দূরে থাক, কেহ কখন সমুদায় ভারতকে স্বপ্নেও দেখে নাই।

ভারত চিরকাল এইরূপ নিঃসম্পর্কীয় আছে। ভারতকে কেহ কখন আপনার বলিয়া জানে নাই। ভারত-সন্তানগণ আপনার জননীকে কখন চিনিতে পারেন নাই। দশজনের জননী হইয়াও যদি তাহারা জননী বলিয়া চিনিতে পারিত তবুও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দুঃখ-মোচন হইত। কিন্তু যখন তিনি চিরকালই অপরিচিত ছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি সন্তানগণের অনুরাগের আর সম্ভাবনা কি? সেই জন্য ভারতের এই দুর্দশা, ভারত পরকীয় হস্তে পতিত হইয়াছেন। ভারত

এখন বন্দিনী, এখন পরের দাসী। তবু এখনও ভারত সন্তানগণের মোহভঙ্গ হয় নাই; এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। হায়, ভারতের ভাগ্য কি শোচনীয়! ধিক ভারত-সন্তানের অনুরাগ!

স্বাভাবিক স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম ভারত হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। কি কি কারণে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা আমরা প্রথম চিন্তায় কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়াছি। যে যে কারণে ঘটুক, সে কারণ-নির্ণায়ক প্রস্তাবের এক্ষণে আবশ্যক হইতেছে না। সে কারণ সমুদায় আমরা নির্ণয় করিতে পারি, আর নাই পারি, তাহাতে আমাদিগের ক্ষতিলাভ নাই। আমাদিগের অভাব যাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি; তাহাই যথেষ্ট। এক্ষণে সেই অভাবের যাহাতে বিমোচন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বদেশ মধ্যে এই দুই অনুরাগের বীজ রোপিত হয়, এবং তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া সেই অনুরাগ যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহাই করা এক্ষণে একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ইয়োরোপীয় সমাজে এই অনুরাগদ্বয় কত প্রবল, তাহা আমরা প্রথম চিন্তায় প্রদর্শন করিয়াছি। তজ্জন্য ইয়োরোপীয় রাজ্য সমুদায় এখন অটল ভিত্তিতে স্থাপিত, ইয়োরোপীয় সমাজের এখন দিন দিন উন্নতি, এবং ইয়োরোপীয় দেশ সমূহ সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। এদেশে স্বাধীনতার সহিতই ঐ দুই সদনুরাগের বীজ বপন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যদি আমরা কোন সবল

ভিত্তির উপর সমাজকে স্থাপিত করিতে চাই, যদি সামাজিক ও স্বদেশীয় শ্রীবৃদ্ধিসাধন আমাদিগের লক্ষ্য হয়, যদি সুখ-সমৃদ্ধি আমাদিগের স্পৃহনীয় হয়, এবং সর্ব্ববিধ উন্নতি ও মঙ্গল যদি আমাদিগের প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, তবে শুদ্ধ স্বাধীনতার বীজ বপন করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিব না; তাহার সহিত স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের ও যাহাতে বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষেও যত্নশীল হইব।

যদি কেহ এমত কথা বলেন যে, ঐ দুই অনুরাগ ত প্রাচীন গ্রীশ ও রোমে বিলক্ষণ প্রবল ছিল, তবে সেই দুই রাজ্যের ধ্বংস হইল কেন? এতদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, যেখানে স্বাধীনতার স্থলে ঘোর সামাজিক অধীনতা ও তৎসঙ্গে এক জাতির অসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ঘটে, সে সমাজের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিয়া আইসে। প্রাচীন গ্রীশ ও রোমের ধ্বংসের কারণ আমরা পূর্ব্বেই পর্য্যালোচনা করিয়াছি। সামাজিক অধীনতাতে দেশকে দুর্ব্বল করিয়া আনে, লোকের স্ফূর্ত্তি তিরোহিত হয়, সুতরাং সেই অনুরাগেরও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়। অধীনতার নিপীড়নে লোকে জর্জ্জরিত হইয়া সকল সদনুরাগকে বিসর্জ্জন দেয়। যে সমস্ত দেশে লোকের স্বাধীনতা নাই, কেবল অধীনতাই প্রবল, সে সমস্ত দেশ শুদ্ধ রাজকীয় বল ও কথঞ্চিৎ স্বদেশানুরাগ এবং স্বজাতিপ্রেমে রক্ষিত হইয়া থাকে। যখন এই রাজকীয় বল বিদেশীয় শত্রুবলের নিকট পরাভূত হয়, তখন তাহা সুতরাং বিদেশীয় রাজার অধীনস্থ হইয়া পড়ে। প্রাচীন গ্রীশ ও

রোমের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। ভারতের এক্ষণে এই অবস্থা। এসিয়ার অন্যান্য রাজ্যে রাজকীয় বল প্রবল থাকাতে, সে সমস্ত রাজ্য আজিও দণ্ডায়মান আছে।

তবে এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে, স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি-সাধন করিলেই দেশের বলোপচয় হয়। আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজ ইহার দৃষ্টান্ত। ইয়োরোপের এক্ষণে যে যে দেশে এই স্বাধীনতার ভাব যে পরিমাণে বিরাজিত ও রক্ষিত, সেই সেই দেশে লোকের বলবীর্য্যের স্ফূর্ত্তির সহিত তাহার উন্নতি ও বলাধানও সেই পরিমাণে জন্মিয়াছে। ইয়োরোপীয় রুশে এক্ষণে রাজকীয় প্রভুতার সহিত সামাজিক স্বাধীনতার বিঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পরিণাম ভবিষ্যতের হস্তে। কিন্তু ইয়োরোপীয় অন্যান্য সমাজে স্বাধীনতার ভিত্তি অত্যন্ত প্রবল। কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কি পারিবারিক স্বাধীনতা, কি সামাজিক স্বাধীনতা, কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সর্ব্ববিধ স্বাধীনতায় সম্পন্ন হইয়া এক্ষণে ইয়োরোপীয় সমাজ দুর্দমনীয়ভাবে উন্নত ও প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেছে। ফরাশী-বিদ্রোহের বৃহৎ সামাজিক বিপ্লবের কাল হইতে ইয়োরোপীয় সমাজে অজেয় মানসদুর্গ মধ্যে স্বাধীনতা স্থাপিত হইয়াছে;—যে দুর্গের চারিদিকে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর বেষ্টিত রহিয়াছে।

এই আদর্শ আমরা পুস্তকের প্রারম্ভেই প্রদান করিয়াছি। তৎপরে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, যে বলে ইয়োরোপীয় সমাজ এত বলবান, যে কারণে

ইয়োরোপীয় সমাজের এত উন্নতি, সেই স্বাধীনতারূপ মহারত্ন ভারতবর্ষীয় সমাজে একান্ত দুর্লভ। আমরা ভারতীয় সমাজের স্তর স্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, তাহার কোন খানে অণুমাত্র স্বাধীনতার ভাব বিদ্যমান দেখি নাই। দেশীয় আচার-ব্যবহারে এবং সমাজস্থ সাধারণ জনগণের মনে কেবল অধীনতার ভাবই বিদ্যমান। এই সমস্ত আচার-ব্যবহার অন্যান্য কারণে শুভ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে, কিন্তু সে চক্ষে তাহাদিগের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি নাই। আমরা শুদ্ধ স্বাধীনতার ভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং এই ভাবের অভাব দেখিয়া আমরা তাহাদিগকে দূষিত বলিয়া কলঙ্কিত করিয়াছি। অন্য তুলে হয় ত তাহাদিগের মূল্য সমধিক দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু এখন কথা এই, আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ তুলে তাহাদিগকে পরিমাণ করা উচিত। কোন্ বিবেচনা এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এক্ষণে যদি সামাজিক মঙ্গল ও স্বদেশীয় হিতসাধন আমাদিগের প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আমাদিগের পরিমাণই গ্রহণীয়। এই পরিমাণে এক্ষণে আমরা সমাজের ভিত্তিমূল পরীক্ষা করিয়া দেখিব; এবং এই ভিত্তিমূল যদি দূষণীয় হয়, সমাজকে তবে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে স্থাপিত করিব। সেই ভিত্তির আদর্শ ইয়োরোপ দিয়াছে। ইয়োরোপের যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধন, তাহা আমাদিগের গ্রহণ করা উচিত। সেই আদর্শ, সেই মহার্ঘ সম্পত্তি—স্বাধীনতার অমূল্য রত্ন।

সমাপ্ত।